ইরিজুক

শশধর বিক্রম কিশোর দেববর্মণ

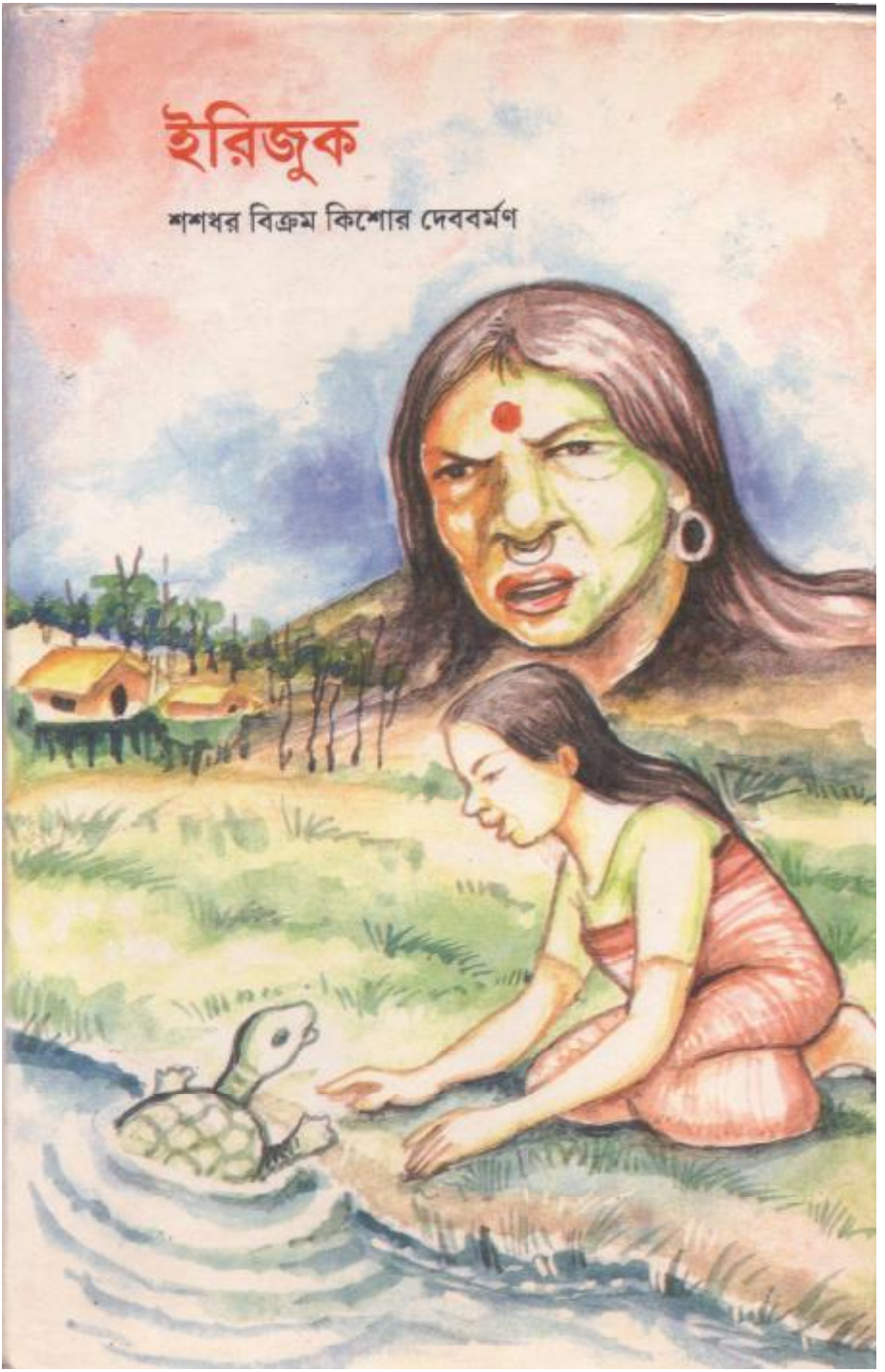

ইরিজুক-সপত্নী

শশধর বিক্রম কিশোর দেববর্মণ

ট্রাইবেল রিচার্স ইনস্টিটিউট
আগরতলা।। ত্রিপুরা

IRRIJUK

by S. B.K. DebBarman
Ex. Director, Tribal Research , Tripura.

প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৪ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী , ১৯৯৯ ইং

প্রকাশক : এস. কে. সরকার
অধিকর্ত্তা, ট্রাইবেল রিচার্স ইনস্টিটিউট
আগরতলা ত্রিপুরা

মুদ্রণ : ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
মেলারমাঠ ।। আগরতলা

প্রচ্ছদ : ফণীগোপাল মোদক

দাম : ৪০ টাকা

দু'টি কথা

প্রত্যেক জাতিরই কিছু কিছু রূপকথা আছে। ঐতিহ্যপূর্ণ ত্রিপুর জাতিও তার ব্যতিক্রম নয়। রূপকথাগুলো শুধু রূপকথাই নয়। শুধু অলস সময়ে চিত্ত বিনোদনই এদের কাজ নয়। বক্তা বা শ্রোতার অজান্তেই এতে জাতির মানসিকতা, ধর্ম, দর্শন, রুচি, শিক্ষা সংস্কৃতির ছোঁয়া লেগে যায়। সুপ্রাচীনকাল থেকে বংশ পরম্পরায় বহুজনের মুখে মুখে এগুলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছে। তাই এগুলোতে ইতিহাসের সময়সীমা বহির্ভূতকালের ইতিহাস লুপ্ত থাকে। তথাকথিত ইতিহাস আমাদিগকে যা দিতে পারে না এগুলি তাই দিয়ে আমাদের সামনে এক অন্ধকার জগতের দরজা খুলে দেয়। তাই ইতিহাসের সময় রেখা বহির্ভূতকালের কিছু জানতে হলে আমাদিগকে অবশ্যই রূপকথাগুলোকে নির্ভর করেই অগ্রসর হতে হবে। এ হিসাবে রূপকথাগুলোর মূল্য অপরিসীম।

এই নিরিখে বিচার করলে ত্রিপুরার রূপকথাগুলোরও যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। এগুলোতে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে রয়েছে গবেষণা সাপেক্ষ অনেক মূল্যবান তথ্য। আর সে কারণেই রয়েছে সভ্যতার কশাঘাত থেকে বাঁচিয়ে এগুলোকে সংকলন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা। ইতিপূর্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু ত্রিপুরার রূপকথা সংকলিত হয়েছে। এ কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের ট্রাইবেল রিসার্চ অধিকারও এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছে। তারই ফলশ্রুতির নিদর্শন বর্তমান রূপকথাটি। পরবর্তীকালে আরও কিছু রূপকথা পুস্তকাকারে বের করার ইচ্ছা আমাদের আছে।

বর্তমান রচনাটি পাঠক পাঠিকার রসোত্তীর্ণ হলে বাধিত হব। এ ব্যাপারে যাদের কাছ থেকে সহৃদয় সাহায্য পেয়েছি তাদেরকে ট্রাইবেল রিসার্চ অধিকারের পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে এ ধরনের সকল প্রকার সহযোগিতা সাদরে গৃহীত হবে।

এস বি কে দেববর্মণ

ট্রাইবেল রিসার্চ অধিকর্তা

ত্রিপুরা।

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে

প্রথম সংস্করণটি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় 'ইরিজোক' দ্বিতীয় সংস্করণটি বের করা হল। এবারের প্রচ্ছদপটটি সাদা-মাটা না করে একটু অন্যরকম করার চেষ্টা হয়েছে। আশা করি, প্রথম সংস্করণের মতো এ সংস্করণটিও পাঠক-পাঠিকা সাদরে গ্রহণ করবেন।

দ্বিতীয় সংস্করণটি বের করতে যাঁরা কোন না কোনভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

এস. কে. সরকার
অধিকর্তা
ট্রাইবেল রিচার্স ইনস্টিটিউট
আগরতলা।। ত্রিপুরা

২২ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ ইং

ইরিজুক

কোন এক সময়ে ত্রিপুরার পাহাড়ী অঞ্চলে বিন্দুরাম হাজারী নামে এক গৃহস্থ বাস করতো। তার সাংসারিক অবস্থা মন্দ ছিল না ; গ্রামের লোকেরাও তাকে মেনে চলতো। তার কোন ছেলে-পুলে না হওয়ায় তার মনে বড়ই দুঃখ। পাড়ার সমবয়সীরাও তার সন্তান না হওয়ার জন্য আক্ষেপ করতো। তাই আর একটি বিয়ে করার জন্য বিন্দুরামকে তারা প্রায়ই পরামর্শ দিতো। তাদের পরামর্শে বিন্দুরামও আর একটি বিয়ে করবে বলে মনে মনে ঠিক করলো। তাদের পাশের গাঁয়ে তখিরায় অছাই নামে একজন লোক বাস করতো। অছাই, ত্রিপুরী ভাষায় পূজককে বলা হয়ে থাকে। সে লোকের বাড়ীতে ত্রিপুরীদের দেবতা পূজার কাজ করে তার সংসার চালাতো। নানা প্রকার যাদুবিদ্যায় সে একজন বড় ওস্তাদ বলে পরিচিত ছিল। তার একটি যুবতী মেয়ে ছিল। বিন্দুরাম তার মেয়েকেই বিয়ে করবে বলে ঠিক করলো। একদিন বিন্দুরাম তার স্ত্রীকে তার মনের কথা বললো – " তোমার যখন কোন সন্তান-সন্ততি হলনা, তখন আমি আর একটি বিয়ে না করলে কেমন করে আমার বংশ রক্ষা পাবে? তোমার ঘরে যদি অন্ততঃ একটি সন্তানও হত, তাহলেও আমি আর বিয়ে করতাম না। কি করবো, বংশ রাখতে আমি বাধ্য হয়ে আর একটি বিয়ে করতে চাই। তুমি কি বলো "? তার স্ত্রী একথা শুনে বললো – "হ্যাঁ, আমার যখন কোন সন্তানই হলনা, তখন তোমার তো সন্তানের জন্য আরেকটি বিয়ে করতেই হবে। আমি তোমাকে বাধা দিচ্ছি না, কিন্তু আমাকে অনাদর করবে না তো" ? বিন্দুরাম হাজারী ব্যস্ত হয়ে বললো – " না - না, তোমার অনাদর হবে কেন ? তুমি আমার বড় বৌ – বড় হয়েই থাকবে । সন্তান হয়নি বলে একদিনওতো তোমাকে আমি অনাদর করিনি।" এভাবে পরস্পর কথাবার্তার পর এক শুভদিনে বিন্দুরাম হাজারী তখিরায় অছাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলো।

বিন্দুরাম তার বৌদের সাথে সমান ব্যবহার করে বাস করতে লাগলো। বড়

বৌ তার ছোট বৌকে নিজের ছোট বোনের মত ভালবাসতো ও আদর করতো। কিন্তু, তার ছোট বৌ বড় সতীনকে সবসময় সন্দেহের চোখে দেখতো। ভিতরে ভিতরে বড়ই হিংসা করতো। বড় বৌটি ছিল সরল প্রকৃতির। ছোট বৌটি ছিল তার বিপরীত।

এমনি করে দিন যায়। ক্রমশঃ ছোট বৌ সন্তান সম্ভবা হল। বিন্দুরাম তার ছোট বৌয়ের ঘরে সন্তান হবে জেনে খুব খুশী হল। তার ছোট বৌ এ সময়ে যা চাইতো, যা খেতে চাইতো, তাই দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করতে লাগলো। যথাসময়ে তার ছোট পত্নী রৌপ্য বর্ণের সাদা ধবধবে এক কন্যা সন্তান প্রসব করলো। রূপার মত সাদা বর্ণ বলে তার নাম রাখা হল "রূফাইতি"। ত্রিপুরী ভাষায় রূপাকে 'রূফাই' বলে। রূফাইতি মানে শুভ্রময়ী বা রজতময়ী। তার মা বাবা ও বড় বৌ কন্যাটিকে অতিশয় আদর যত্নে প্রতিপালন করতে লাগলো। বড় বৌ তার নিজের সন্তান মনে করে রূফাইতিকে মায়ের মতই যত্ন করতে লাগলো। স্তন দেওয়া ছাড়া ছোট বৌয়ের আর কিছুই করতে হত না। বড় বৌ-ই সবসময় কোলে পিঠে করে পালতে লাগলো।

এদিকে রূফাইতি দু'তিন বৎসরে পা দিলে বিন্দুরামের বড় পত্নীর গর্ভ সঞ্চারের লক্ষণ দেখা দিলো। হাজারী তার বড় বৌয়ের গর্ভে সন্তান হবে জেনে মনে মনে খুব আনন্দিত হল। ছোট পত্নী কিন্তু তা দেখে হিংসায় জ্বলতে লাগলো। মনে মনে ভাবছে — যদি তার সতীনের ঘরে ছেলে হয়, তাহলে স্বামী তার বড় সতীনকে আরও ভালবাসবে। তখন হয়তো আমাকে অনাদর করতে আরম্ভ করবে। এইসব কাল্পনিক কথা ভেবে ছোট বৌ হিংসায় অস্থির হয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ কিছু করতেও সাহস পাচ্ছিল না।

দিনের পর দিন যায়, যথাসময়ে বড় বৌ একটি সন্তান প্রসব করলো। কিন্তু ছেলে হলো না — একটি অতি সুন্দরী কাঁচা সোনার বর্ণ বিশিষ্টা এক কন্যা জন্মগ্রহণ করলো। হাজারী আনন্দিত হয়ে তার নাম দিলো রাংচাকতি। ত্রিপুরী ভাষায় সোনাকে 'রাংচাক' বলা হয়। রাংচাকতি মানে স্বর্ণময়ী। এভাবে তার

দু'টি কন্যা রাংচাকতি ও রূফাইতি আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো। এদিকে ছোট বৌ শুধু তার সতীনকেই হিংসা করতো না, এর সাথে সাথে রাংচাকতিকেও তার রূপগুণ ইত্যাদি দেখে ভয়ানক হিংসা করতো। তার কন্যা রূফাইতি অপেক্ষা রাংচাকতি সব বিষয়েই ভাল ছিল। এসমস্ত কারণে ছোট বৌ এক এক সময় হিংসায় অস্থির হয়ে উঠতো। নিজের মেয়েকে আদরের কোন ত্রুটি করতো না বড় পত্নী, কিন্তু সপত্নী সন্তান বলে রূফাইতিকেও অনুমাত্র হিংসা করতো না। নিজের সন্তান জ্ঞানে সমান চক্ষে উভয়কেই দেখতো, কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করতো না।

সপত্নীর এরূপ হিংসাবৃত্তির পরিচয় পেয়েও সরলমতি বড় বৌ উপেক্ষা করেই যেতো, এসব বিষয়ে কোনদিন স্বামীর কাছে একটি কথাও বলতো না। এভাবে দিন যেতে লাগলো ক্রমশঃ মেয়ে দুটি আট-নয় বৎসরে উত্তীর্ণ হল।

এদিকে ছোট বৌয়ের অন্তর হিংসায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। কিভাবে তার সতীনের অনিষ্ট করা যায় তাই শুধু তার ভাবনা হয়ে পড়লো। পিতার নিকট শেখা যাদুবিদ্যাও তার কম জানা ছিল না। তাই সে যাদুমন্ত্রের দ্বারা সতীনের অনিষ্ট করবার জন্য উপায় অনুসন্ধান করতে লাগলো।

একদিন বিন্দুরাম হাজারী তার কৃষিকার্যে যাবার পূর্বে তার দু'পত্নীকে বললো — "ক্ষেত হতে এসে খেয়ে যেতে আমার বড়ই অসুবিধা হয়ে থাকে, তাই আমি বাড়ীতে আসবো না। তোমরা খাবার তৈরী করে ক্ষেতেই খাবার পাঠিয়ে দিয়ো। দুপুরবেলা আমি ক্ষেতের কাজেই থাকবো, বাড়ীতে আসবো না"। একথা বলে হাজারী ক্ষেতের কাজে চলে গেল। এ কথায় ছোট বৌ বেশ খুশীই হল। মনে মনে ভাবছে— "এবার ভাল সুযোগই পাওয়া গেল। সতীনের খাবার অবসান করতেই হবে। তা না হলে আমি কোন প্রকারেই সুখী হতে পারবো না।" ঘরের রান্না-বান্নার কাজ সে নিজেই অতি আগ্রহের সহিত শেষ করে তার বড় সতীনকে বললো - "দিদি, রান্নাবান্না হয়ে গেছে, চল আমরা চান করিগে। তারপর এসে রূফাইতির বাবার খাবার দিয়ে আসবো।" উভয়ে তাদের বাড়ীর

নিকটবর্তী এক ছোট পুকুরে চান করবার জন্য চলে গেল। তারা সর্বদাই এই পুকুরের জল ব্যবহার করতো। কোনদিন তারা একসাথে এবং কোনদিন বা একা একাই চান করে যেতো। আজ কিন্তু ছোটপত্নী অতিশয় আগ্রহ দেখিয়ে তার বড় সতীনকে ডেকে নিয়ে গেল। সরলমনা বড় সতীন সোজা মানুষ। সে তার ছোট সতীনের ব্যবহারে অনুমাত্র সন্দেহ করল না ; খোলা মনেই সে তার সঙ্গে একত্রে চান করার জন্য চলে গেল। দুজনে একসঙ্গে চান করছে। এমন সময় ছোট সপত্নী আপন মনে কি যেন বলতে লাগলো। বড় বৌ তার একটি কথাও বুঝতে পারলো না। তারপর বড় সতীনের কপালে একটি টোকা দিয়ে দিলো ; বড় সতীন তৎক্ষণাৎ একটি কচ্ছপ হয়ে জলে নেমে গেল। তারপর যাদুকরী অতি ব্যস্তভাবে বাড়ীতে দৌড়ে এসে তার সপত্নী কন্যা রাংচাকতিকে ডেকে বলছে - "রাংচাক, তোর মাকে চারপাঁচজন পুরুষ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। আমি অতি কষ্টে তাদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছি।" রাংচাকতি একথা শুনে কিছুই বুঝতে না পেরে মাকে ডেকে ডেকে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো। তাকে কাঁদতে দেখে তার সৎমা অতিশয় ব্যস্ততার সহিত বলছে — "রাখ, এখন কাঁদিস না। তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আসছি। তোরা দু'জনে ঘরে থাক —" বলে পাগলের মত দৌড়াতে লাগলো। ইচ্ছা করেই সে জঙ্গলের কাঁটা গাছে কাপড় জানিয়ে ছিঁড়ে এলো চুলে দৌড়ে তার স্বামী যে ক্ষেতে কৃষি কাজ করছিল সেদিকে যেতে লাগলো। হাজারী তাকে এভাবে আসতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলো। তারপর সে নিজেই অগ্রসর হয়ে ছোট পত্নীর অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলো — " কি হয়েছে, কেন এত ব্যস্ত হয়ে এভাবে দৌড়ে এলে?" ছোট পত্নীর মুখ হতে কোন কথাই যেন বের হচ্ছে না। থর থর করে সে কাঁপতে লাগলো এবং চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো। হাজারী কিছুই বুঝতে না পেরে অতিশয় চিন্তাকুল হয়ে তার কাছে বসে পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলো— "বলনা ছোটবৌ, কি হয়েছে। তুমি যদি কিছুই না বল তাহলে আমি কি করবো ?" স্বামীর আদরে বিগলিত হয়ে আরও ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। হাজারী মনে মনে ভাবছে — "নিশ্চয় বড় বৌয়ের সঙ্গে একটা কিছু হয়েছে, তাই নালিশ করতে এসেছে। পূর্বেও বড় বৌয়ের নামে সে অনেক নালিশ

করেছে — তা হাজারী বেশ ভালভাবেই জানতো এবং হিংসাবশত যে করতো তাও তার জানাই ছিল। কিন্তু বড় বৌ কোনদিনও তার ছোট সপত্নীর বিরুদ্ধে স্বামীর কাছে একটি কথাও বলতো না। হিংসা-দ্বেষ করার মত স্বভাব বড় পত্নীর ছিল না, একথা হাজারী বেশ ভালভাবেই জানতো। স্বামী সেবা, ঘর সংসারের কাজকর্মাদি সব বিষয়ে হাজারী তার বড় বৌ-এর উপরেই নির্ভরশীল ছিল। তার এ সমস্ত গুণে বিন্দুরাম হাজারীর বড় পত্নীর প্রতি গভীর ভালবাসাই ছিল। ছোট বৌ যদিও তার সপত্নীর বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত নানাপ্রকার দোষ দেখিয়ে স্বামীর কাছে মিথ্যা কথা লাগাতো, কিন্তু হাজারী তা শুনেও শুনতো না। ছোট বৌকে সে বিয়ে করবার আগ্রহে করেনি, করেছে শুধু সন্তান প্রাপ্তির ঐকান্তিকতার জন্য। তা না হলে তার মনের মত বড় বৌকে রেখে সে কখনও বিয়ে করতো না। ছোট বৌ-এর এরূপ নীচ প্রকৃতির জন্য হাজারী তাকে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা ও উপেক্ষার চক্ষেই দেখতো। সে একজন ভয়ঙ্করী যাদুকরী একথা তার জানা ছিল না। এখন তার সর্বনাশ করে তার অতি ভালবাসার বড় বৌকে কচ্ছপ রূপে পরিণত করে দিয়ে স্বামীর মন ভুলাবার জন্য কেঁদেকেটে অস্থির ভাব দেখাতে লাগলো। হাজারী তার ছোট বৌ-এর কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করছে — "কেন কাঁদছো, কি হয়েছে বল না কেন?" বলতে যেন খুব ভয় পাচ্ছে ঠিক এমনিভাবে বলছে "তোমার কাছে কেমন করে আমি একথা বলবো? আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে গো। আজ আমরা দুজনে একসাথেই পুকুরে চান করতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ জঙ্গল হতে চারপাঁচজন পুরুষ এসে দিদিকে সামনে পেয়ে জোর করে ধরে নিয়ে চলে গেছে। দিদি অনেক ধস্তাধস্তি করেছে, কিন্তু কোনমতেই ছাড়িয়ে আসতে পারলো না। তারা ধরাধরি করে জঙ্গলের ভিতর চলে গেল। আমি অতি কষ্টে দৌড়াতে দৌড়াতে তোমার কাছে চলে এসেছি।" একথা শুনে হাজারী ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে তার ছোট পত্নীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে অস্থির হয়ে বললো — "এতক্ষণ তুই আমায় একথা বলছিস না কেন? চল যাই, কোথায় কোন জায়গায় ধরে নিয়ে গেছে। চল্ তাড়াতাড়ি, হতভাগী, এতক্ষণ ধরে বলছিস না কেন? মায়া কান্না কাঁদছিস।" এই বলে পত্নীর হাতে ধরে টানতে টানতে পুকুরে যাওয়ার রাস্তার একধারে জঙ্গলের নিকট নিয়ে গেল।

তার স্ত্রী জঙ্গলের দিকে হাত দেখিয়ে বললো — "ঐ জঙ্গলে দিদিকে ধরে নিয়ে ঢুকেছিল।" বিন্দুরাম হাজারী অতিশয় ব্যস্ত হয়ে জঙ্গলে ঢুকে পাতি পাতি করে দেখলো, কিন্তু কোথাও তার হদিস্ পেলো না।

এরূপ মর্মান্তিক ব্যাপারে হাজারী অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে বাড়ীতে এসে তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে নানাদিকে অনুসন্ধান করতে লাগলো। কিন্তু সে আর কোথায় তার প্রিয়তমা বড় বৌয়ের সন্ধান পাবে? তাকে যে তার সপত্নী যাদুবিদ্যায় তুকতাক্ করে কচ্ছপ করে ফেলেছে। হাজারী তার প্রিয়তমা পত্নীকে না পেয়ে খাওয়া নেই, শোয়া নেই, মর্মাহত হয়ে শুধু তারই কথা ভেবে ভেবে স্তব্ধ হয়ে গেল। কন্যা রাংচাকতি তার মাকে হারিয়ে সর্বদা কান্নাকাটি করে — তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে মার সংবাদ জিজ্ঞেস করে। এরূপ মর্মন্তুদ অবস্থায় হাজারী নিজের অসহনীয় ব্যাথা চেপে রেখে কন্যা রাংচাককে আদর করে মিথ্যা সান্তনায় ভোলাতে চেষ্টা করতো। এভাবে হাজারী দিনের পর দিন নানা জায়গায় খোঁজ করে কোথাও তার পত্নীর খোঁজ না পেয়ে যখন সন্ধ্যা সময় বাড়ীতে ফিরে আসতো রাংচাক দৌড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে মার খোঁজ করে বিলাপ করে কাঁদতো। এরূপ মর্মস্পর্শী ব্যাপারে হাজারীর অন্তর দুর্বিষহ হয়ে উঠতো। কি করবে, মেয়েকে আদর করে মিথ্যা স্তোক বাক্যে সান্তনা দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। একদিন রাত্রে বহু কান্নাকাটি করে রাংচাক পিতার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো। পিতা কন্যার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আর অশ্রুজল রাখতে পারলো না, নীরবে কাঁদতে লাগলো। তার প্রিয়তমা পত্নীর কথা মনে পড়তে লাগলো। কারণ তার বড় পত্নীর অভাবে যেন তার ঘর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তার কন্যা রাংচাককে দেখে মনে মনে ভাবছে — "আহা, মা হারা মেয়ে আমার, যেন সোনার পুতুল! সোনার পুতুলও বোধ হয় এত কমনীয় হবে না।" মনে মনে বলছে — "রাংচাক, মা আমার, তুই মা হারা হয়েছিস। কোথায় যে তোর মার সন্ধান পাবো, আমি যে আর উপায় দেখতে পাচ্ছি না।" এভাবে স্ত্রীর কথা ভাবতে ভাবতে মর্মব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়লো।

এদিকে যাদুকরী ছোটপত্নী এসে স্বামীকে খাবার জন্য অনেক ডাকাডাকি করতে লাগলো। কিন্তু হাজারী বিরক্ত হয়ে তাকে বললো – "আমার ক্ষিদে নেই। আমি খাব না, তুমি খেয়ে নাও।" বলে কন্যা রাংচাককে বুকে নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। এভাবে প্রতিদিন রাত ভোর হলেই সামান্য কিছু খেয়ে হাজারী কিছু লোক নিয়ে নানা জায়গায় গিয়ে স্ত্রীর খোঁজ করতো। কিন্তু কোথাও খোঁজ না পেয়ে ক্রমশঃ গ্রামের লোকেরাও নিরুৎসাহ হয়ে গেল। হাজারীও আর কোন উপায় না দেখে মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে দিন কাটাতে লাগলো।

যাদুকরী ছোটপত্নী এদিকে বেশ সুবিধা পেয়ে তার সপত্নী কন্যা রাংচাকের উপর ক্রমশঃ নির্যাতন করতে শুরু করে দিল। সে নিজে নিজে ভাবছে – "বাপ সোহাগী মেয়েকে এবার দেখিয়ে দেবো, কেমন করে সৎমার ঘরে থাকতে হয়!" এদিকে হাজারী প্রায়ই কাজে কর্মে নানাদিকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হত। সবসময় ঘরে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হত না। এই সুযোগে যাদুকরী, রাংচাককে নানাভাবে নির্যাতন দিতে লাগলো। তার নিজের কন্যা রূফাইকে আগে ভাল খাবার দিয়ে তার উচ্ছিষ্ট খাদ্য রাংচাককে খেতে বাধ্য করতো। রূফাইতি খেয়ে যা অবশিষ্ট থাকতো সেগুলি তাকে খেতে দিত এবং মাটিতে যে সামান্য ভাত পড়তো সেগুলোও তাকে কুড়িয়ে খেতে হত। যদি রাংচাক বলতো – "মা ভাতে যে বালি, খেতে পারছিনা", তার সৎমা বলতো – "আমি কি করবো, খেতে না পারিসতো ফেলে দে।" কিন্তু তার পরিবর্তে আর এক কণা ভাতও তাকে দিত না। রাংচাক নিরুপায় হয়ে মাটিতে ফেলা ভাতগুলো তুলে জল দিয়ে ধুয়ে খেতে বাধ্য হত। এমনি করে প্রতিটি দিন খেতে বসলেই তার কান্না পেতো। রূফাইতির উচ্ছিষ্ট অর্ধভুক্ত যে সামান্য খাদ্য পড়ে থাকতো, তাই রাংচাকতির ভাগ্যে জুটতো। বিমাতার ভয়ে পিতার কাছেও কিছু বলতে রাংচাকতি সাহস পেতো না। পেটভরে কোনদিনও সে খেতে পেতো না। তার পিতাও এসকল অবস্থা কিছুই জানতো না। এভাবে রাংচাক তার পরিমাণ মত খাদ্য না পেয়ে দিন দিন ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগলো। সর্বদা ক্ষিধায় তার পেট জ্বালা করতো। তথাপি সে ভয়ে কারো কাছে একটি কথাও প্রকাশ করতো না।

একদিন দুপুরবেলা চান করতে গিয়ে সে পুকুর পাড়ে বসে মনের দুঃখে তার মার কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলো। মনের ঐকান্তিক দুঃখে উদ্বেল হয়ে তার মাকে ডেকে ডেকে মর্মান্তিক সুরে বিলাপ করছিল — "অ আমা, আমা, নুংলে ব-র থাঙ্গয় তংখা, আং হা অ কালাইতংমানি মাই চানানি মাইয়া, বহক রিঅগয় তংখা। আংলে ন-ন পকনানি মাইয়া, নুং ছে বাহাই খালাইঅয় আ-না পকয় তংখা। অর্থাৎ - মাগো, মা আমার, তুমি কোথায় গিয়ে রয়েছ। আমি মাটিতে পড়া ভাত খেতে পারছিনা, আমার পেট জ্বলছে গো। আমি তো তোমায় ভুলতে পারিনা, তুমি কেমন করে আমায় ভুলে রইলে।

এমন সময় কচ্ছপরূপী তার মা মেয়ের কাতর কান্না শুনে আর থাকতে পারলো না। কচ্ছপটি জলের উপর ভেসে উঠে মাথা তুলে তার মেয়ের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে পাড়ে উঠে এসে বালির উপর স্থির হয়ে বসে রইল। রাংচাক কচ্ছপটিকে দেখে কি জানি কেন মমতায় আপ্লুত হয়ে পড়লো এবং অন্তরে যেন বেশ একটা শান্তি অনুভব করতে লাগলো। বুক ভরা মমতা নিয়ে সে আস্তে আস্তে কাঁদতে কাঁদতে কচ্ছপটির কাছে গেল। কচ্ছপটিও তাকে দেখে একটুও ভয় না পেয়ে মাথা তুলে একদৃষ্টে তার মেয়ের পানে চেয়ে রইল। রাংচাক তার নিকটে বসে কচ্ছপটির সারা শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো। কচ্ছপটি স্থির হয়ে মাথা বের করে তার প্রতি চেয়ে রইল। কামড় দেওয়া বা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করলো না। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে হেঁটে জলে নেমে গেল। রাংচাক দেখতে পেলো যে জায়গায় কচ্ছপটি বসেছিল সেখানে বিশ-পঁচিশটি ডিম পড়ে আছে। রাংচাক তাড়াতাড়ি কচ্ছপের ডিমগুলো পেয়ে অতিশয় আনন্দিত হয়ে চান সেরে ক্ষুধার তাড়নায় ডিমগুলো খেয়ে চলে গেল। ডিমগুলো খেয়ে তার পেট ভরে গেল। তার সৎমা রাংচাকতিকে ডেকে মাটিতে ফেলা ভাত কুড়িয়ে খেতে দিলো। কিন্তু রাংচাক সামান্য মাত্র খেয়ে আরগুলো ফেলে দিলো।

এভাবে রাংচাক প্রতিদিন পুকুর পাড়ে গিয়ে ঘাটে বসে তার মাকে ডেকে ডেকে বিলাপ করে কাঁদতো, আর কচ্ছপটি জল থেকে উঠে এসে বালির উপর

ডিম পেড়ে রেখে চলে যেতো। রাংচাক সেগুলো খেয়ে চলে যেতো। তাতে তার দেহের সৌন্দর্য আরও কাঁচা সোনার বর্ণে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলো। সে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে উঠলো। কচ্ছপের ডিমগুলো খাওয়ার পর হতে সে নিজেও শরীরে বেশ শক্তি পেতে লাগলো। এভাবে অবাধে বেশ কতক মাস চলে গেলো। কিন্তু তার মায়াবী সৎমা গোপনে গোপনে রাংচাকতির প্রতি লক্ষ্য করতো লাগলো। আর ভাবতে লাগলো - "আমার কন্যা রূফাইতিকে ভাল ভাল খাবার খাওয়াচ্ছি — তথাপি কেন তার স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে না। আর সপত্নী সন্তান রাংচাকতিকে অর্ধাহারে রেখেও দেখতে পাচ্ছি তার সোনার মত গায়ের রং আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। একটা সন্দেহ করে ভাবতে লাগলো — নিশ্চয় সে লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু একটা খেতে পাচ্ছে। তা না হলে এভাবে তার স্বাস্থ্য থাকার কথা নয়। একথা ভেবে মায়াবী ছোট বৌ গোপনে ঘরের সমস্ত জিনিষ দেখতো লাগলো। কিন্তু সব জিনিষই ঠিক আছে। ঘরের কোন জিনিষ খাওয়ার কোন প্রমাণই পেলো না। মাটিতে ফেলা কুড়ান ভাত ব্যতীত কোনদিনই রাংচাকতিকে সে পেট ভরে খেতে দেয়নি। তাই তার মনে ভয়ানক একটা সন্দেহ উপস্থিত হল। রাংচাকতির অগোচরে বেশ ভালভাবেই সে সন্ধান নিতে লাগলো। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও কিছুই জানতে পারলো না। তারপর নিজে অনুসন্ধান নিতে ব্যর্থ হয়ে তার কন্যা রূফাইতিকে রাংচাকের পিছে লাগিয়ে রাখল। কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে কেমন করে লক্ষ্য রাখতে হবে সব কথা তাকে শিখিয়ে বললো — "যা জানতে পারবি সব আমাকে এসে বলবি। তুই সর্বদা রাংচাকতির সাথে সাথে থাকবি। এক মুহূর্তও তার কাছ ছাড়া হবিনা মা, বুঝলি? তারপর যা করতে হবে আমি করবো"।

মার নির্দেশমত রূফাইতি তারপর হতে রাংচাকতির পাশ নিলো। রাংচাকতির কাছ ছেড়ে সে কোথাও যায় না। সর্বদা তার সঙ্গে এমনভাব দেখাতে লাগলো যেন সে তার অতি প্রিয় খেলার সাথী। রাংচাকতি একটি নতুন উৎপাত এসে উপস্থিত হল দেখে বড়ই দুর্ভাবনায় পড়ে গেল। মনে মনে ব্যাকুল হয়ে ভাবতে লাগলো — "কেমন করে আমি তার কাছ ছাড়া হবো ! কেমন করেই বা একা

চান করতে যাবো ? যদি আমাকে কচ্ছপের ডিম খেতে দেখতে পায় তবে সে গিয়ে সৎমাকে সকল কথা বলে দেবে; তাহলে না জানি কি করবে বলতে পারি না।" এসকল কথা ভেবে সে অন্তরে অন্তরে বড়ই অস্বস্তি বোধ করে অস্থির হয়ে উঠলো। একথা কারো কাছে প্রকাশ করতে না পেরে নীরবে একা চান করতে যাওয়ার উপায় চিন্তা করতে লাগলো।

তারপর দুপুর হলে রাংচাকতির ক্ষিধেয় পেট জ্বলতে লাগলো। তার বোন সঙ্গে থাকায় কোন প্রকারেই সে একা যেতে পারছে না। এদিকে কিন্তু বড় বোন রূফাইতি ইচ্ছে করেই খেলার ভান করে রাংচাককে তার সাথে খেলতে বাধ্য করে রাখলো। তার নিজের তো রাংচাকের মত ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে না, তার যে পেট ভরা। তার উদ্দেশ্য রাংচাক কি করে তাকে এড়িয়ে একা চান করতে যায় তা দেখা ; আর রাংচাকতি ভাবছে কি করে দিদিকে রেখে একা চানে যাবে। দুজনের উদ্দেশ্য দু'রকম অথচ কেউ কারো উদ্দেশ্য জানাতে চাচ্ছেনা। উপায় নেই দেখে রাংচাক বাধ্য হয়ে বললো — "দিদি, আমার বড়ই ক্ষিধে পেয়েছে। তুমি খেল, আমি চান করি গে।" বড় বোন বললো - "বেশ তো, চল না দুজনে একসাথে চান করে আসবো। তারপর আবার আমরা খেলবো।" ছোট বোন বললো— "তুমি খেল দিদি, আমি তাড়াতাড়ি চান করে চলে আসবো; নাহলে তুমি আগে গিয়ে চান করে এসো, তারপর আমি যাবো।" কিন্তু বড় বোন তাতে রাজী হল না। কি আর করবে রাংচাক ! অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেটের জ্বালা সহ্য করে খেলতে লাগলো। কিন্তু তার বড়ই অতিষ্ঠবোধ হতে লাগলো। রূফাইতি মনে মনে ভাবছে— "রাংচাক আমার সাথে একসঙ্গে চান করতে চায় না; এর একটা কারণ আছে, তা আমার দেখতেই হবে।" তারপর সে ছল করে বললো— "রাংচাক, যা তুই আগে গিয়ে চান সেরে আয়, আমি পরে চান করে আসবো। তুই এলেই আমি যাবো।" একথা শুনে সরল প্রাণা রাংচাক মনে মনে বড়ই খুশী হয়ে বললো— "আচ্ছা, আমি এখনই চলে আসছি বলে পুকুর পাড়ে গিয়ে বসে ক্ষিধেয় ও দুঃখে মাকে স্মরণ করে বিলাপ করে ডাকতে লাগলো। রাংচাকতির মর্মভেদী ডাকে কচ্ছপটি পাড়ে উঠে — বালির উপর

আগের মতই অনেকগুলো ডিম পেড়ে রেখে আবার চলে গেল। রাংচাকতি চান সেরে ডিমগুলো খেয়ে চলে এলো। এদিকে তার বোন রূফাইতি লুকিয়ে থেকে সব ব্যাপার দেখতে পেয়ে তার মার কাছে সকল কথা বলে দিলো।

মায়াবী ছোট পত্নী মেয়ের নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনে বুঝতে পারলো এবং মনে মনে বলছে— হ্যাঁ, আমি রাংচাকতির মাকে কচ্ছপ করে রেখেছি। তার মা কচ্ছপটি ডিম পেড়ে তার মেয়েকে খাওয়াচ্ছে। আচ্ছা, এর প্রতিকার করছি ; তা নাহলে আমি অছাইয়ের মেয়েই নই। কচ্ছপ করে দিয়েছি, তথাপি মেয়েকে ডিম পেড়ে পেড়ে খাইয়ে আদর দেখাচ্ছে। এবার তার সাজা ভাল করে দিতে হবে। এসকল কথা চিন্তা করে করে মায়াবী স্ত্রী রাগে জ্বলতে লাগলো। রাত্রে যখন রূফাইতি ও রাংচাকতি খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লো তখন যাদুকরী স্ত্রী তার স্বামীর আহার প্রস্তুত করে খেতে বসালো। বিন্দুরাম হাজারী যখন খেতে আরম্ভ করলো, তার স্ত্রী নিকটে বসে বলতে লাগলো — "আজ আমাদের পুকুরে একটি বেশ বড় কচ্ছপ দেখতে পেয়েছি। ওটাকে কাল ধরে দিতে হবে। মাংস খাওয়া দরকার। এছাড়া খাওয়া দাওয়ারও ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। ওটাকে ধরতে পারলে বেশ টাটকা মাংস খাওয়া যাবে, কি বল? মেয়েরাও মাংস খেতে বলছে।" বিন্দুরাম হাজারী খেতে খেতে বললো — "বেশ তো, ওটাকে কাল ধরা যাবে। পুকুরের জল সেচে ধরতে হবে।"

পরদিন উভয়ে মিলে খুব ভোর হতে পুকুরটি সেচতে লাগলো। জল কমে গেলে যাদুকরী স্ত্রী কচ্ছপটিকে দেখতে পেয়ে ধরতে গেল, কিন্তু কচ্ছপটি মাথা বের করে কামড় দিতে চাইলে আর ধরতে সাহসী হল না। স্বামীকে বলতে লাগলো — "ওগো, তুমি এসে কচ্ছপটি ধর, আমায় কামড়াতে চায়। বিন্দুরাম হাজারী যখন কচ্ছপটি ধরতে গেল সে আর এক পাও নড়লো না। ইচ্ছে করলে বোধ হয় কচ্ছপটি তাকেও কামড়াতে পারতো। কিন্তু পতিভক্তি পরায়ণা বড় পত্নী তার স্বামীর কাছে শান্তভাবেই ধরা দিলো এবং মাথা বের করে তার স্বামীর মুখ পানে অতি করুণ নয়নে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। কথা বলতে পারছে না, তবু যেন তার বুক ফেটে যেতে লাগলো। অজস্র ধারায় কচ্ছপটির চোখ হতে জল

ঝরতে লাগলো। এগুলো কিন্তু তার স্বামী হাজারী কিছুই লক্ষ্য করছে না, লক্ষ্য করছে শুধু যাদুকরী স্বপত্নী।

এদিকে দু'বোনে এসে দেখতে পেলো তাদের বাবা কচ্ছপটিকে ধরে পাড়ে তুলে নিয়ে আসছে। বড় বোন রূফাইতি বলছে– "বাবা, এটাকে কেটে ফেলো। আজ আমরা মাংস খাবো।" রাংচাক কেঁদে কেঁদে বলছে – "বাবা, এটাকে কেট না, ছেড়ে দাও। ও খুব ভাল বাবা, সে আমাকে প্রতিদিন ডিম পেড়ে পেড়ে খাইয়েছে।" যাদুকরী ওকে ভীষণ ধমক দিয়ে বললো – "তুই একা একা ডিম খাবি, আর বুঝি কেউ খেতে পাবে না। যা – এখান থেকে চলে যা।" স্বামীকে বলতো লাগলো – "কেটে ফেলো, এটাকে রান্না করতে হবে না?" মাংসলোভী হাজারী রাংচাকতির কথা বুঝতে না পেরে দা নিয়ে কাটতে বসে গেল। রাংচাক এ দৃশ্য দেখে আর সেখানে থাকতে পারলো না। কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে দৌড়ে চলে গেল। কচ্ছপটির এ অবস্থা দেখে তার বুক ফেটে যাবার উপক্রম হচ্ছে । ঘরে গিয়ে বিছানায় পড়ে কেঁদে কেঁদে চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগলো। এদিকে হাজারী কচ্ছপটি কেটে কাজে চলে গেল।

যাদুকরী অতিশয় খুশী মনে সপত্নীর মাংস রান্না করে খাবার জন্য তার স্বামীর অপেক্ষা করে রইল। তার নিজের মেয়ে রূফাইতিকে প্রচুর মাংসের ঝোল দিয়ে খাইয়ে দিল। তার মেয়ের খাওয়ার পর অবশিষ্ট যে সামান্য উচ্ছিষ্ট ভাত ছিল রাংচাককে তা খেতে দিলো। রাংচাকতি কচ্ছপের মাংস না খেয়ে সমস্ত হাঁড়গুলো বেছে বেছে একত্র জমা করে রাখলো। এক টুকরা মাংসও সে মুখে দিলো না। কচ্ছপটিকে এভাবে ধরে কাটতে দেখে ভয়ানক ব্যাথা পেয়েছে ও । সেদিন তার খাওয়াই হল না। খেতে বসেও তার বুক ফেটে যেন চৌচির হয়ে যাচ্ছিলো। তবু সে তার মনের দুঃখ চেপে রেখে হাঁড়ের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে একত্র করে রাখলো। উচ্ছিষ্ট সে সামান্য ভাত তাকে খেতে হত সেগুলো জলে ধুয়ে সামান্য মাত্র খেয়ে নিলো।

হাজারী কাজ থেকে ফিরে এলে যাদুকরী স্ত্রী স্বামীকে প্রচুর খেতে দিলো।

মনে মনে বলতে লাগলো — "তোমার অতি ভালবাসার বড় বৌয়ের মাংস দিয়ে পেট ভরে খাও ; একদিন তাকে নিয়ে কতই না সুখ-ভোগ করেছ — এখন তার মাংস খেয়ে নাও। সতীনের সঙ্গে স্বামীকে ভাগ করে নিয়ে ঘর করতে যাবো, সে প্রকৃতির মেয়ে আমি নই। এবার তা শেষ করেছি।" হাজারীর খাওয়া শেষ হলে যাদুকরী মনের আনন্দে সতীনের মাংস দিয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে খেতে বসলো। মনে মনে বলতে লাগলো — ভালবাসা দেখিয়ে আমাকে বশ করে রাখবে মনে করেছিলে, আমি তোমার ভালবাসার কাঙ্গাল নই। এবার তোমার হাঁড়-মাংস চিবিয়ে খেয়ে মনের জ্বালা জুড়াবো।" খাওয়া শেষ হলে রাংচাকতিকে ডেকে এটোগুলো তুলে নিতে বললো। এভাবে প্রত্যেকদিন তাদের খাওয়া হলে সমস্ত এটো থাল-বাসন ধুতে রাংচাকতিকেই হত। সেদিন এটো পরিষ্কার করতে করতে রাংচাক তার চোখের জলকে কিছুতেই মানিয়ে রাখতে পারছে না। মনে মনে ভাবছে — "আজ হতে আমি সত্যি সত্যিই মা হারিয়েছি। এদিন কচ্ছপটি ডিম খাইয়ে আমার প্রাণ রেখেছিল ; তার প্রতি মমতায় মার দুঃখও ভুলেছিলাম। মা মা বলে কাঁদলে সে এসে উপস্থিত হত। মার প্রতি আমার যে ভালবাসা ছিল ; সে ভালবাসা কচ্ছপটির উপর নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছিলাম। আজ সে-ও নেই।" এই বলে রাংচাক কাঁদতে লাগলো। সমস্ত হাঁড়ের টুকরোগুলো একটি নেকড়ায় একত্রে বেঁধে তাদের বাড়ীর অল্প দূরে জঙ্গলে একগাছের ফোকরে কচ্ছপের হাঁড়ের পুঁটলিটি স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে লুকিয়ে রেখে এলো। সুযোগ মত প্রায়ই সে হাঁড়ের পুঁটলিটি দেখে আসতো।

এভাবে রাংচাকের দিনগুলো সুখে-দুঃখে চলে যাচ্ছে। কিন্তু পরিমাণমত খেতে না পেয়ে শুকিয়ে যেতে লাগলো। কাজ করার ইচ্ছা থাকলেও পেরে উঠতো না। এদিকে যাদুকরী সৎমার তাড়নাও অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগলো। হাজারীর নিকট মিথ্যা নানারূপ দোষ দেখিয়ে তাকে শাসন করার জন্য জেদ করতে লাগলো। স্ত্রৈণ হাজারী যাদুকরী স্ত্রীর কথায় সত্য মিথ্যা কিছুই বিচার না করে অনর্থক রাংচাকতিকে অনেক গালমন্দ দিতো। এমনকি স্ত্রীর কথায় মারধোর করতো। সঙ্গে সঙ্গে যাদুকরী সুবিধা পেয়ে রাংচাকতিকে বলতে লাগলো —

"দুষ্ট মেয়ে তোর মাকে লোকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তাকে খোঁজ করেও পাওয়া গেল না। তুই মা হারা মেয়ে, তোর এত অহঙ্কার কেন ? কাজকর্ম কিছুই করবি না, রাজকন্যার মত বসে বসে খাবি। তুই যেখানে খুশী চলে যা তোকে কে ধরে রাখছে।" এ সমস্ত কথা শুনেও রাংচাকতি তার বাপের কাছে একটি কথাও বলতো না । কারণ সে বেশ ভালভাবেই জানে বাবার কাছে বলে কিছুই হবে না। বরঞ্চ তাকে আরও লাঞ্ছনাই ভোগ করতে হবে। তাই মুখ বুজে সকল যন্ত্রণাই সে সহ্য করতে লাগলো। সকল কথা তার বাবা বিশ্বাসও করবে না। বিপরীত ফলই ফলবে বলে সমগ্র যন্ত্রণা মাথা পেতেই নিত। একদিন তার বাবা রেগে গিয়ে স্ত্রীকে বলে দিলো — "আজ হতে তাকে ঘরের কাজকর্ম ও রান্নার কাজে লাগাবে। সংসারের কাজকর্মও শেখা দরকার। অনর্থক কেন বসে বসে অন্ন ধ্বংস করবে।"

যাদুকরী স্ত্রী স্বামীর কথায় আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঘরের সব কাজের ভার রাংচাকতির উপর চাপিয়ে দিয়ে মা-মেয়ে বেশ আরামে রাংচাকের প্রাণপাত সেবা গ্রহণ করতে লাগলো। এভাবে প্রত্যেক দিন ঘর নিকানো উঠান ঝাঁট দেওয়া, রোদে ধান শুকোতে দেওয়া, ধান ভাঙ্গা, জঙ্গল হতে লাকড়ি বয়ে আনা, জল তুলে আনা, সকলের খাবার রান্না করা ও খেতে দেওয়া ইত্যাদি সব কাজ করতে হত রাংচাকতিকে। রাংচাকতি তার বোন রূফাইতির মত অলস ও আরাম প্রিয় ছিল না। সে ছিল স্বাবলম্বী এবং কর্মঠ। কাজ করতে তার কোন আপত্তি ছিল না। কাজ ছাড়া বসে থাকতেও সে ভালবাসতো না। কাজের মধ্য দিয়েই সে মনের দুঃখ ভুলে থাকবার চেষ্টা করতো। কোনদিন সে কোন কাজে একটা আপত্তিও করতো না। মুখ বুজেই সমস্ত কাজ করে যেতো।

একদিন তার বাবা খেতে বসে রাংচাককে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করতে দেখে খুব খুশী হলো। তাকে আস্তে আস্তে বলছে– "মা রাংচাক, তুই সংসারের কাজকর্ম ভাল করে শিখে নে। আমরা যে মা গরীব। গরীবের ঘরেই যে একদিন ঘর করতে হবে। মেয়েদের গেরস্থালী কাজ জানা নিতান্ত প্রয়োজন। তা নাহলে স্বামীর ঘর কেমন করে করবি মা। অকর্মা মেয়েরা সংসারের কাজ ভালভাবে

করতে পারে না বলে স্বামীর ঘরে গিয়ে কষ্ট পেয়ে থাকে। তুই স্বামীর ঘরে গিয়ে যাতে কষ্ট না পাস তাই আমি চাই। তোর কাজে যেন কেউ দোষ ধরতে না পারে ; তাই তোকে কাজ করতে বলছি। পরিণামে তুই সুখী হবি মা, কোন চিন্তা করিস্ না।" বাবার কথা মনোযোগ দিয়ে রাংচাক শুনল। বাবার উপদেশ রাংচাকের মনে খুব সাহস জোগাল। এখন থেকে সব কাজ রাংচাক নিজের হাতেই করে। এখন তার খাওয়া দাওয়াও রীতিমত চলছে। সৎমা ও মেয়ে খেয়ে দেয়ে চলে গেলে সকলের পরে সে খেতে বসতো। সোমত্ত মেয়ে রাংচাকের খাওয়া দাওয়ার ব্যপার নিয়ে বিমাতাও এখন বেশী কড়াকড়ি করতে সাহস পায় না। তাই খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে রাংচাক বলতে গেলে নিশ্চিন্ত। তার অতিরিক্ত খাটুনি দেখে সময় সময় হাজারীও তার পক্ষ টেনে বলত। তাই যাদুকরী বিমাতাও অনেকটা সংযত হতে বাধ্য হয়েছিল।

এদিকে রাজ্যের রাজার মৃত্যু হওয়ায় যুবরাজ সিংহাসনে বসবেন বলে রাজ্যময় ধূমধাম লেগে গেছে। এ উপলক্ষে গ্রামের সর্দার, প্রধান মাতব্বর, প্রজাদের রাজ দরবারে নিমন্ত্রণ। নতুন রাজা সিংহাসনে বসবেন। তাই মহাভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। বিন্দুরাম হাজারীও নিমন্ত্রণ পেলো। বিমাতা একথা জেনে তার মেয়ে রূফাইতিকে নিয়ে সেও স্বামীর সঙ্গে রাজধানীতে যাবে বলে ঠিক করলো। রাংচাকতিকে বললো— "তোর গিয়ে কাজ নেই, বাড়ীতে থেকে ঘর আগলাবি।" রাংচাক কাচুমাচু হয়ে বলছে — আমায় নিয়ে যেও মা, আমি কেমন করে একা একা থাকবো ? রাজসিংহাসনে বসার উৎসব আমারও দেখতে ইচ্ছা হয়।" বিমাতা তার কথা শুনে রেগে গিয়ে রুক্ষভাবে বলতে লাগলো — "জও-ন থাংখালাই, ছা-বছে চিনি নগ-ন মুরুগনাই ছাদি। নফা ফাইথুন, নিনি ফিকুং বাইরুনা হিনয় ছাওয়ানু। তমানি নুং বা আনি কক খানাইয়া অং ? নুং আ-র তা-ম খালাইনানি থাংনানি নাইখাদে ? অর্থাৎ - সকলেই যদি যাই, তবে আমাদের ঘর কে আগলাবে বল ? তোর বাপ আসুক তোর পিঠ ভেঙ্গে দিতে বলবো। কেন, তুই আমার কথা শুনিস না ? তুই সেখানে গিয়ে কি করবি ?" এই বলে বিমাতা গালাগালি দিতে লাগলো। রাংচাক দুঃখিত হয়ে

কাঁদতে লাগলো।

হাজারী বাড়ী এলে রাজবাড়ীর উৎসবে হাজারী স্ত্রীসহ রূফাইতিকে নিয়ে যাবে বলে ঠিক হল। রাংচাক বাড়ীতে থেকে ঘরদোর আগলাবে। পাড়ার লোকেরা তাদের বাড়ীতে একজন বা দুজন লোক রেখে দলে দলে অভিষেক উৎসব দেখবার জন্য রাজধানীতে যেতে লাগলো। হাজারীও স্ত্রী কন্যাসহ যথাসময়ে রাজধানীর পথে রওয়ানা হয়ে গেল। রাংচাক যেতে না পেরে একা একা কাঁদতে লাগলো। হঠাৎ হাঁড়ের পুঁটলীটির কথা তার মনে পড়লো। একা একা বসে তার বাল্যজীবনের কথা, তার মার কথা ভাবতে লাগলো। মার কথা মনে করে কাঁদতে কাঁদতে হাঁড়ের পুঁটলিটি গাছের গর্ত হতে বের করে খুলে দেখবে বলে যেতে লাগলো। মনে মনে ভাবছে — "আজ যদি আমার মা থাকতো তাহলে কখনও আমাকে একা ফেলে যেতো না ; মা নেই, সৎমা বলেই রেখে যেতে পারলো।" এসব কথা ভাবছে আর হাঁড়ের পুঁটলির জন্য একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করছে। সে আকর্ষণ তাকে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। জঙ্গলে গিয়ে সে আস্তে আস্তে গাছের গর্তের ভিতর থেকে পুঁটলিটি বের করে নিয়ে এলো। হাঁড়গুলো এদ্দিনে হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে ভেবে তাড়াতাড়ি খুলে দেখে অবাক হয়ে গেল। সেখানে হাঁড় কোথায় ! অনেকগুলো সোনার মূল্যবান অলঙ্কার ঝক্ ঝক্ করছে ! রাংচাক অবাক হয়ে প্রত্যেকটি অলঙ্কার গায়ে পরে দেখতে লাগলো। আশ্চর্য, অলঙ্কারগুলো তার গায়ে বেশ খাপ খেয়ে লেগে গেলো ! শাড়ী, জামাগুলোও রাংচাকতির গায়ে মাপমত লেগে গেলো। এক জোড়া সোনার কাজ করা জুতাও তার পায়ে খুব সুন্দরভাবে লেগে গেলো। তাড়াতাড়ি সে আবার খুলে পুঁটলিতে বেঁধে সঙ্গে করে বাড়ীতে নিয়ে এলো। সে মনে মনে এখন একটা সাহস পেতে লাগলো, যা তাকে রাজধানীতে যেতে বাধ্য করলো।

তাদের পাড়ার লোকেরা সকলেই বৌ-মেয়ে নিয়ে দলে দলে যাচ্ছে। তা দেখে রাংচাকতিও সাধারণ কাপড় পরে পুঁটলিটি সাবধানে হাতে নিয়ে অন্য গ্রামের মেয়েদের দলে মিশে রওয়ানা হয়ে গেল। কত লোক দলে দলে যাচ্ছে।

কে কার খোঁজ করে ! রাংচাকতিকেও তাদের গ্রামের লোক ভেবে কেউ বিশেষ লক্ষ্য করলো না। সে নির্বিঘ্নে তাদের সাথে রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হল। খাবার সময় দলের লোকদের সাথে প্রচুর পরিমাণে খেয়ে একসময়ে তাদের থাকবার জায়গায় এসে পুঁটলি হতে অলঙ্কারগুলো বের করে পরে নিলো রাংচাকতি। সোনার জুতা পায়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি তাদের দলের মেয়েদের মাঝে মিশে গেল। সকলেই রাজ দর্শনের জন্য উৎসুক, কেউ তার দিকে লক্ষ্য করবারও সুযোগ পেলো না। রাজাকে অভিবাদন করবার জন্য লোকের ভয়ানক ভীড়। এই ভীড়ের মধ্যেই সে দলের লোকদের সাথে রাজাকে দর্শন করে তাড়াতাড়ি লোকের ভীড় ঠেলে বের হয়ে আসবার সময় লোকের পায়ের চাপে এক পায়ের জুতা খুলে গেল। সেটা সে তুলে আনবার সুযোগ পেলো না। কি করবে, তাড়াতাড়ি গয়না ও কাপড় খুলে আবার পুঁটলিতে বেঁধে নিলো এবং সাধারণ শাড়ী পরে যারা রাজদর্শন করে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হচ্ছিল তাদের সাথে রওয়ানা হল। এভাবে নির্বিবাদেই সে তার মা বাবা আসার আগেই বাড়ীতে চলে এলো এবং পুঁটলিটি আবার সেই গাছের গর্তে নিয়ে লুকিয়ে রেখে দিলো। এক পায়ের জুতা ফেলে আসতে তার মনে মনে খুবই দুঃখ হতে লাগলো। এদিকে তার বিমাতা, বাবা ও বড় বোন রাজবাড়ীতে প্রচুর ভোজন করে আনন্দের সহিত বাড়ীতে ফিরে এলো। বড় বোন রূফাইতি বাড়ীতে হেসে হেসে রাংচাকতির কাছে বলছে — "কি ভাল ভাল খাবার খেয়েছি রাংচাক, এমন খাবার জীবনেও খাই নি। তোকে যদি মা-বাবা নিয়ে যেতো তুইও খেতে পেতি।" রাংচাক কৌতুহলী হয়ে সব কথা শুনছে। রূফাইতি আপন মনে বলতে লাগলো - "আমাদের রাজা কি সুন্দর, সিংহাসনে বসে থাকতে দেখে এসেছি। তাঁকে দেখলে জীবন সার্থক হয়। তাঁর সুন্দর রূপটি আমার চোখে ভেসে রয়েছে।" রাজার সৌন্দর্যের কথা শুনে রাংচাক মৃদু হেসে বললো — "তা হলে দিদি তুমি রাজাকে বিয়ে করে নাও না" - রূফাইতি হেসে হেসে বললো — "দূর পাগলী, আমার মত হতভাগীকে রাজা বিয়ে করবে কেন?" এদিকে দুবোনে কথা হচ্ছে — ওদিকে হাজারী ও তার স্ত্রীর মধ্যে কথা হচ্ছে। স্ত্রী বলছে — "আমাদের রাজা কত সুন্দর। আমার রূফাইতিকে যদি বিয়ে করে নিতো কতই না সুখী হতাম।"

তা শুনে হাজারী শ্লেষের সহিত বলছে — 'তোর তো সখ কম নয়, ফকিরের ছেলের ঘোড়া চড়ার সখ! তোর মেয়েকে বিয়ে করতে রাজা বসে রয়েছে।" স্ত্রী বলছে— "কেন, আমার রূফাই মন্দ কিসে ? তার মত গায়ের রং ক'টি মেয়ের দেখতে পেয়েছ ? আমার রূফাইর মত আর একটি মেয়ে দেখাও তো দেখি।' হাজারী বলছে - "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোর রূফাইর জন্য রাজা খাওয়া শোয়া ছেড়ে দিয়ে বসে রয়েছেন ! এভাবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নানা কথাবার্তা চলল। পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে এভাবে রাজ্যাভিষেকের কথাই কতকাল চলতে থাকবে।

রাজ্যাভিষেকের পরদিন অভিষেক মঞ্চ পরিষ্কার করবার সময় রাজবাড়ীর মালী মঞ্চের একদিকে একপাটি অতিসুন্দর সোনার জুতা পেলো। মালী জুতাটি পেয়ে তাড়াতাড়ি রাজার নিকট গিয়ে হাত জোড় করে বললো - "মহারাজ, সিংহাসন মন্ডপ পরিষ্কার করতে গিয়ে আপনার জুতা পেয়েছি।" রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন — "কোথায় দেখি !" রাজার সামনে জুতাটি রেখে মালী দাঁড়িয়ে রইল। রাজা ভাল করে দেখে বললেন — "এ জুতা তো আমার নয়, এ যে মেয়েদের পায়ের জুতা। এখানে জুতাটি রেখে যাও।" জুতার দিকে তাকিয়ে রাজা চিন্তা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর হঠাৎ রাজার স্মরণ হল — "হ্যাঁ, আমি যখন সিংহাসনে বসেছিলাম তখন মেয়েদের দলের সামনে একটি দেবকন্যার মত অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে অভিবাদন করে তাড়াতাড়ি লোকের ভীড় ঠেলে যেতে দেখেছি। কিন্তু কোথায় চলে গেল লক্ষ্য রাখতে পারি নি। মেয়েটির সারা গায়ে সুন্দর অলঙ্কার ছিল। নিশ্চয় সেই মেয়েটিরই এই সোনার জুতা। তা ছাড়া অন্য কারোর হওয়া সম্ভব নয়। মেয়েটির কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপটি রাজার চোখের সামনে যেন ভেসে উঠতে লাগলো। সেদিন — ঠিক সে সময় থেকে রাজা অন্তরে অজানা প্রিয়ার স্বপ্ন রচনা করতে শুরু করলেন।

পরদিন উজীর, নাজির, অমাত্যবর্গের কাছে জুতাটি আনিয়ে জানালেন — এই একপাটি সোনার জুতা যে মেয়ের পায়ে ঠিক মাপ মত লাগবে তাকেই আমি বিয়ে করে রাজরাণী করবো। অমাত্যবর্গ সকলেই সোনার কারুকার্য খচিত জুতাটি

দেখে অবাক হয়ে বলাবলি করতে লাগলেন – "এত সুন্দর জুতা তো আর কখনো দেখি নি। এ নিশ্চয় কোন এক মহাভাগ্যবতীর জুতা। তা নাহলে এমন জুতা কে পরতে পারে !" রাজা সহাস্যে বললেন - "হ্যাঁ, নিশ্চয় ভাগ্যবতী, তা নাহলে এমন জুতা পরে আর কে আসবে ? তাই আমি স্থির করেছি, এ জুতাটি যার পায়ে ঠিকমত লাগবে সে-ই এ জুতার অধিকারিণী এবং তাকেই আমি মহারাণী করব।" পাত্রমিত্র অমাত্যবর্গ সকলেই রাজার বাক্যে সন্তুষ্ট হয়ে সমর্থন জানাতে লাগলো। রাজা তার একান্ত সেবক, সর্দার, জমাদার ও অন্যান্য লোককে একত্র করে বলে দিলেন – "তোমরা এই সোনার জুতাটি নিয়ে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। প্রত্যেক ঘরে গিয়ে যাদের কুমারী মেয়ে আছে তাদের পায়ে লাগিয়ে দেখবে। যার পায়ে জুতাটি ঠিক মাপ মত লাগবে তাকেই রাজরাণী রূপে নির্দিষ্ট করে খাড়াইতিয়া সেনা রেখে এসে আমায় সংবাদ দেবে। তোমরা আজই এই সোনার জুতা নিয়ে ঘুরতে আরম্ভ করবে। নাও, জুতাটি যত্ন করে সঙ্গে রাখবে বলে সর্দারের হাতে দিয়ে দিলেন।

তারপর সর্দার ও জমাদার লোকজনসহ গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে প্রতিটি বাড়ীর মেয়েদেব পায়ে জুতাটি লাগিয়ে দেখতে লাগলো। কিন্তু কারো পায়েই জুতাটি লাগলো না। যার পায়ে জুতাটি লাগবে তাকে রাজরানী করা হবে শুনে প্রত্যেক বাপ-মাই তাদের কুমারী মেয়েদের পায়ে আগ্রহের সহিত লাগাতে দিতে লাগলো। কিন্তু কারো পায়েই জুতাটি লাগলো না। এভাবে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে ঘুরে প্রায় ছয়মাস চলে গেল। কিন্তু কোথাও কোন মেয়ের পায়েই জুতাটি লাগতে দেখা গেল না। এমনি করে তারা ঘুরতে ঘুরতে বিন্দুরাম হাজারীদের পাড়ায় এসে উপস্থিত হল। প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে তারা কুমারী মেয়েদের পায়ে একে একে লাগিয়ে দেখতে লাগলো। এবার তারা বিন্দুরাম হাজারীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। রাজার সর্দার ও জমাদার বিন্দুরাম হাজারীকে সকল কথা জানালো। বিন্দুরাম হাজারী সর্দার ও জমাদারকে সমাদরে বসবার আসন দিয়ে বসালো।

বিন্দুরাম হাজারীর যাদুকরী পত্নী আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার কন্যা

রূফাইতিকে ডেকে জুতা লাগিয়ে দেখবার জন্য উৎসাহিত করতে লাগলো। "যাও রূফাই, জুতাটি পায়ে দিয়ে দেখো, যদি লেগে যায় তো তাহলে তুমি রাজরাণী হবে মা।" বিন্দুরাম হাজারীও রূফাইতিকে তার মার কথানুসারে জুতাটি পায়ে লাগিয়ে দেখবার জন্য ডাকতে লাগলো। এদিকে রাংচাক ঘরের ভিতর হতে ঘরের বারান্দায় বসা সর্দারের হাতে তার হারানো সোনার জুতাটি দেখে কাঁদতে লাগলো। রূফাইতি গিয়ে জুতাটি পায়ে লাগাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তার পায়ে জুতাটি ঢুকলোও না। লজ্জা পেয়ে রূফাইতি তাড়াতাড়ি ঘরে চলে এল। যাদুকরী মেয়ের পায়ে জুতা লাগলো না দেখে রেগে গিয়ে রাংচাককে লুকিয়ে থাকবার জন্য ধমক দিয়ে বলতে লাগলো – "এখানে বসে রয়েছিস কেন , যা কাজকর্ম করগে।" এমন সময় বারান্দায় বসা সর্দার বিন্দুরাম হাজারীকে বললো – "হাজারী, এ মেয়েটি কে? এমন সুলক্ষণা মেয়ে তো আমরা আর কোন গ্রামে দেখতে পাইনি। এমন সোনার মত গায়ের রং, যেন সোনার প্রতিমা খানি।" সকলেই অবাক হয়ে রাংচাকের দিকে চেয়ে রইল। আমার ছোট মেয়ে – বলে পরিচয় দিলো হাজারী। সর্দার রাংচাকতিকে ডেকে বললো – "এসতো মা লক্ষ্মী, তোমার পায়ে জুতাটি হয় কিনা পরে দেখ তো মা।" যাদুকরী পত্নী অস্থির হয়ে এসে বললো – "না না, ওর পায়ে হবে কেন, অনর্থক লাগিয়ে কাজ কি ?" সর্দার বললো – "হোক আর নাই হোক, আমরা পায়ে লাগিয়ে দেখবো। রাজার আদেশ আমরা পালন করবই। যতক্ষণ জুতা কারো পায়ে না লাগে ততক্ষণ আমরা প্রত্যেকটি কুমারী মেয়ের পায়েই লাগিয়ে দেখবো।" তথাপি যাদুকরী আপত্তি জানিয়ে নির্লজ্জের মত বলল – "আমার মেয়ের পায়ে যখন জুতাটি লাগলো না, তখন ওর পায়েও লাগবে না।" এবার কিন্তু হাজারী উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীকে বললো – "হোক না হোক, লাগিয়ে দেখতে তোমার এত আপত্তি কেন? এস মা রাংচাক, পায়ে লাগিয়ে দেখতো মা।" রাংচাক ম্লান মুখে এসে সহজেই জুতাটি পায়ে ঢুকিয়ে নিলো। ঠিক ঠিক মাপ মত লেগে গেল। সর্দার , জমাদার ও খাড়াইতিয়া সৈন্যরা আনন্দের সহিত রাংচাকতিকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। পাড়া প্রতিবেশীরা সকলে খুশী হয়ে রাংচাকতির সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে লাগলো। তারা বলতে লাগলো - "বেশ ভাল হয়েছে।

এদ্দিনে বিধাতা তাকে কৃপা করেছেন। বিমাতার অত্যাচারে এতদিন মেয়েটা বড়ই কষ্ট পাচ্ছিল, এবার রক্ষা পাবে। এমন সুন্দরী শান্ত মেয়ে বাস্তবিক রাজরাণী হওয়ারই যোগ্যা।" কিন্তু যাদুকরী হিংসায় অতিষ্ট হয়ে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো। এদিকে রাজার সর্দার, জমাদার রাংচাকতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে তার প্রতি যাতে কোনপ্রকার মন্দ ব্যবহার বা অসম্মান দেখানো না হয় তারজন্য সকলকে সাবধান করে দিলো। হাজারীও রাংচাকতির খাওয়া দাওয়া ও চলাফেরার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে লাগলো। এরূপ অবস্থায় যাদুকরী বাধ্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। রাংচাক নিজে রান্না-বান্না করে রাজবাড়ীর লোকেদের দেখে শুনে খাইয়ে দিলো। সর্দার, জমাদার প্রভৃতি সকলেই খেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে রাংচাককে মা লক্ষ্মী, রাজরাণী মা বলে প্রশংসা করতে লাগলো। হাজারীও মেয়ের অতি ভদ্র ও বিনম্র ব্যবহারে অন্তরে অন্তরে বড়ই আনন্দিত হল।

জমাদার ও খাড়াইতিয়াদের রেখে সর্দার রাজার নিকট সংবাদ দেওয়ার জন্য চলে গেল। সর্দারের কাছে সকল কথা শুনে রাজা আনন্দিত হয়ে মহামাত্য ও পারিষদবর্গ সকলকে জানালেন। অমাত্যবর্গ সকলেই আনন্দিত হয়ে রাজার শুভ বিবাহের কথা আলোচনা করতে লাগলেন। এক শুভদিনে, শুভক্ষণে বিয়ের দিনস্থির করে হাতী, ঘোড়া ও বাদ্য বাজনাসহ বহু সৈন্যসহ সেনাপতিকে মহাসমারোহে বিন্দুরাম হাজারীর বাড়ীতে কন্যা আনবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। পাড়া প্রতিবেশী সকলে এবং স্ত্রীলোকেরা রাজবাড়ী হতে প্রেরিত গয়না ও কাপড়-চোপড় পরিয়ে রাংচাকতিকে অতি সুন্দর করে সাজিয়ে দিলো। রাংচাক তার বাবা মা ও বড় বোন রূফাইতিকে প্রণাম করে নিলো। পাড়ার সকল মান্য ব্যক্তিদের প্রণাম করে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল রাংচাকতি। বিন্দুরাম হাজারী মা হারা কন্যার প্রতি মমতায় কাঁদতে কাঁদতে বললো – "মা, আজ থেকে তুই রাজরাণী হলি, সুখী হ' মা। স্বামী সোহাগিনী হ' মা। তোর বাপ হয়ে আজ আমার জীবন সার্থক হল।" চোখের জলেই হাজারী রাংচাককে রাজবাড়ীর সুন্দর সাজানো পাল্কীতে তুলে দিলো। রাংচাক কাঁদতে কাঁদতে কাউকে একটি কথাও বলতে পারলো না। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। রাজবাড়ীর লোকেরা রাংচাকতির আদেশের

অপেক্ষায় হাত জোড় করে রইল। সর্দার এসে রাংচাকতির কাছে যাত্রার আদেশ চাইলে সে ইসারায় জানিয়ে দিলো। তারপর হাতী-ঘোড়া ও বাদ্য বাজনার মিছিল চলতে আরম্ভ করলো। বিন্দুরাম হাজারী ও পাড়ার সর্দারেরা নিমন্ত্রিত হয়ে হাতীর পিঠে চড়ে মিছিলের সাথে সাথে চলল।

যথাসময়ে মিছিলটি রাজবাড়ীতে গিয়ে পৌঁছল। নিয়মানুযায়ী মহাসমারোহে রাজার সাথে রাংচাকের বিয়ে হয়ে গেল। রাজার বিয়েতে প্রজারা প্রচুর ভোজ পেয়ে রাজা ও রাণীর শুভকামনা করতে লাগলো। বিন্দুরাম হাজারী ও পাড়ার সর্দার মাতব্বরেরাও সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হল। অমাত্যবর্গ ও পারিষদেরা সকলেই রাণীর সৌন্দর্য দেখে প্রশংসা করতে লাগলেন। রাজাও রাণীর সৌন্দর্যে মজে গেলেন ; বাঞ্ছিত প্রিয়াকে পেয়ে রাজারও আনন্দের সীমা নেই!

মহা আনন্দোৎসবের মাঝে রাজার বিয়ে হয়ে গেল। রাজা রাজরাণী রাংচাককে নিয়ে ফুলশয্যায় গেলেন। রাজা তাঁর রাণীকে আদর করে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করছেন—"রাণী, তোমার আরেকটি সোনার জুতা কোথায়?" রাণী লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলেন। আবার রাজা একটু আগ্রহভরে বললেন — "বল না রাণী, আমাকে এত লজ্জা কিসের? আমি যে তোমার চিরসাথী, আপনজন। আজ থেকে তুমি আমার — আমি তোমার। চিরদিন তুমি আমার বুকে থাকবে বলেই আশা করি। তোমার বুকে আমাকে রাখবে রাণী ?" রাণী রাংচাক কোনদিন এমন মধুর কথা শুনেন নি। চিরকাল বিমাতার কঠোর রাণী শুনেই অভ্যস্ত ; তাই রাজার আদরে, কথায় তাঁর চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল। উত্তর করলেন — "রাখবো"। রাজা হেসে হেসে আবার বললেন — "তুমি আমাকে ভালবাসো রাণী?" এবার কিন্তু রাণী হাসতে বাধ্য হলেন। মৃদু হেসে নিম্নস্বরে বললেন— "বাসি"। রাজা উৎসাহিত হয়ে বললেন—"বুঝলে রাণী, আমি যেদিন রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে প্রজাদের অভিবাদন নিচ্ছিলাম তখন তোমাকে লোকের ভীড়ের মাঝে আমার সামনে এগিয়ে আসতে দেখেছিলাম। কিন্তু তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে প্রণাম করে ভীড়ের মাঝে উধাও হয়ে গেলে, লক্ষ্য রাখতে পারি নি। সে সময় তুমি অনেক অলঙ্কার পরে

এসেছিলে সেগুলো কোথায়? সোনার জুতাটি কেন ফেলে গিয়েছিলে? একপাটি জুতা তো আমার কাছে রইল, আর একপাটি কোথায় রাণী ? তোমার ফেলে যাওয়া একপাটি সোনার জুতাই যে তোমায় ধরে নিয়ে এলো গো।" রাজা আবার সহাস্যে বললেন — "কথা বল না রাণী, কথা বলছো না কেন ?" রাজার ভালবাসা পেয়ে রাণী অনেকটা সহজ হতে পেরে আস্তে আস্তে তাঁর জীবনের সকল ঘটনা, বিয়ের পূর্বে যা যা ঘটেছে সব কথা বলে রাজাকে শুনালেন। আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা শুনে রাজা কখনো দুঃখিত কখনো উত্তেজিত হয়ে সকল কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন — "আহা, বড়ই মর্মান্তিক কথা শুনালে রাণী। ঐ কচ্ছপটি নিশ্চয় কোন দেবতা। তোমার দুঃখ দেখে ডিম পেড়ে খাইয়ে তোমার জীবন বাঁচিয়েছিলেন। তাই আজ আমি তোমাকে রাণীরূপে পেয়েছি। বুঝলে রাণী, ঐ কচ্ছপরূপী দেবতাই আমাদের মিলনের মূল কারণ। তাঁর হাঁড়গুলো অলঙ্কার ও জুতা হয়ে আমাদের মিলনের সূত্র তৈরী করে দিয়েছে। বিমাতার নির্যাতনের যন্ত্রণা তুমি যথেষ্ট পেয়েছ সত্য, একপক্ষে সেটা তোমার পক্ষে কল্যাণও হয়েছে। তোমার অনিষ্ট করবার উদ্দেশ্যে সে যা যা করতে চেয়েছিল তা সে করতে পারেনি। বাস্তবিক, তোমার এসকল কথা শুনে বিস্ময় বোধ করছি। এখন রাণী হয়েছো। আমার বুক থেকে তোমাকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছিলাম তখন আমার কি মনে হয়েছিল জান রাণী? নিশ্চয় তুমি কোন দেবকন্যা, আমাকে ছলনা করে বিদ্যুতের মত হঠাৎ জনারণ্যে মিশে গিয়েছ। ভাল করে দেখতে পারি নি। আরও নিকটে আসলে ভাল করে দেখবো বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু নিকটে আর আসনি। প্রথম দেখেই আমি তোমায় রাণী করবো বলে স্থির করেছিলাম এবং তোমাকে পাব কি পাব না কত কথাই ভেবেছিলাম। কিন্তু তোমার সোনার জুতাটি আমার পরম সহায়ক হয়ে উঠলো।" রাজা আনন্দিত হয়ে বলছেন — "সত্যি রাণী, তুমি চিরদিন আমায় ভালবাসবে ?" নতমস্তকে সলজ্জিতভাবে রাণী উত্তর করলেন — "হ্যাঁ মহারাজ, আমি চিরদিন আপনাকে ভালবাসবো। আপনিই যে আমার সব, একমাত্র অবলম্বন।" রাজা বললেন — "দেখ রাণী, তুমি আমায় আপনি বলবে না। কেন না তুমি যে আমার একান্ত

আপনজন, আপনজনকে আপনি বলতে নেই। আজ হতে আমরা দু'টি প্রাণ একত্র হয়েছি। এখন আমরা চিরসাথী, কাউকে ছেড়ে কেউ কিছুতেই— থাকতে পারবো না। আমরা আজ থেকে কেউ কারো চেয়ে ছোটও নই বড়ও নই, উভয়ে আমরা সমান।" রাণী ব্যস্ত হয়ে বললেন — "না না মহারাজ, আমি কেন আপনার সমান হবো, আপনি যে আমার পতি দেবতা।" রাজা বাধা দিয়ে একটুখানি উত্তেজিত হয়ে বললেন — "দেখ রাণী, আমি তোমাকে 'আপনি' বলতে নিষেধ করেছি, তথাপি তুমি আপনি বলছো। তুমি আমাকে আপনি বলে বহুদূরে ঠেলে দিচ্ছ। রাণী ব্যস্ত হয়ে বললেন — "না না মহারাজ, আমি কেমন করে দূরে ঠেলে দেবো — 'তুমি, কথা যে আমার মুখে আসছে না।" এ বলে রাণী মাথানত করে রইলেন। রাজা সহাস্যে বললেন — "মুখে আনতে হবে। কেউ কারো দেবতা হতে পারে না। একথা তুমি নিশ্চিত জেনে রেখো। আমরা চিরসাথী, সমভাগী ও সমধর্মী। তোমার উপর আমার যে দায়িত্ব আমার উপরও তোমার সে দায়িত্ব রয়েছে। নারীকে সেবিকা , দাসী ইত্যাদি করে পুরুষ দেবতা সেজে কেবল পূজাই গ্রহণ করবে, এ বর্বরতা আমি মানতে বাধ্য নই। সবচেয়ে সত্য কি জান রাণী? নিজের কাছে একান্তভাবে সত্য হওয়া। নিজেকে জানাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তাকেই বলে আত্মদর্শন। তুমি আছ আর আমি আছি। এই সত্য চিরদিন সামনে রাখতে হবে। মানুষের অন্তর বলে একটি স্বাধীন সত্তা আছে, তাকে কেউ অধীন করে রাখতে পারে না। তাকে বশ করে রাখতে যাওয়া পাশবিক বৃত্তি বলেই মনে করি। তাকে নীতি শাস্ত্র দিয়ে বেঁধে রাখাও বর্বরতার কৌশল মাত্র।" রাণী রাজার উত্তেজিত ভাব দেখে ভীতা হয়ে বললেন — "আচ্ছা মহারাজ, এখন হতে আমি 'তুমি' বলেই কথা বলবো।" রাজা বললেন — "হ্যাঁ, তাই বলবে রাণী।" রাণী সলজ্জ স্বরে বললেন — "আচ্ছা মহারাজ, আমি যে জঙ্গলের কথা বলেছি, সে জঙ্গল হতে আমার অলঙ্কারের পুঁটলিটি এনে দিতে পারবে?" রাজা আনন্দিত হয়ে রাণীকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন — "হ্যাঁ, আমি কাল খুব ভোরে সেনাপতি ও জমাদারকে পাঠিয়ে তোমার অলঙ্কারের পুঁটলিটি আনিয়ে দেবো, তুমি ভেবো না।" এভাবে দুটি তরুণ প্রাণ সুখ দুঃখের কথা বলতে বলতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজা তাঁর সহৃদয়তার নব পরিণীতা রাণী রাংচাকতিকে আপন করে নিলেন। রাণীও রাজার অকৃত্রিম ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। রাজা যা ভালবাসেন তাই করবেন বলে মনে মনে স্থির করে নিলেন। পরদিন খুব ভোরে রাজা সর্দারকে ডেকে রাণীর রাখা অলঙ্কারের পুঁটলিটি জঙ্গলের গাছের গর্ত হতে আনবার জন্য বলে দিলেন। সর্দার লোকজন নিয়ে বিন্দুরাম হাজারীর পাড়ায় গিয়ে গাছের গর্ত হতে পুঁটলিটি নিয়ে যথাসময়ে রাজার নিকট এনে দিলো। রাজা পুঁটলিটি রাণীর হাতে দিয়ে দিলেন। রাণী পুঁটলিটি পেয়ে আনন্দিত হয়ে খুলে রাজাকে অলঙ্কার, কাপড়-চোপড় ও একপাটি সোনার জুতা দেখালেন। সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যগুলো দেখে রাজা বিস্মিত হয়ে প্রশংসা করতে লাগলেন এবং হারানো সেই একপাটি জুতা রাণীকে ফিরিয়ে দিলেন। সমস্ত অলঙ্কার ও কাপড়-চোপড় পরে রাণী সেজে দাঁড়ালে রাজা রাণীর রূপসুধা পান করতে লাগলেন। রাণীর কমনীয় কান্তিতে রাজা মুগ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন — "সত্যি রাণী, তুমি এত সুন্দরী ! যেন স্বর্গের দেবী।" রাণী লজ্জিতা হয়ে নতমস্তকে মৃদু মৃদু হেসে অলঙ্কার ও কাপড়-চোপড়গুলো খুলে যত্ন করে ভাল বাক্সে তুলে রেখে দিলেন।

রাজার যাবতীয় সেবা যত্নের কাজ রাণী নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন। কোন বিষয়ে রাজার কোন অসুবিধা যাতে না হয় তার দিকে নজর রেখে সাংসারিক কাজ অতি সুন্দরভাবে গুছিয়ে করতে লাগলেন। নিজ হাতে স্বামীর বিছানা পরিষ্কার করে সোনার বাটায় পান সাজিয়ে বাটা ভরে রাখেন। রাজা যা খেতে ভালবাসেন নিজে যত্ন করে রান্না করে সোনার থালে তা সাজিয়ে কাছে বসে দেখে শুনে খাওয়ান। খাওয়ার পর রাজার মুখ, হাত, পা ধুয়ে দিয়ে গামছা দিয়ে মুছে দিতেন। এসব কাজ কোন দাস দাসীকে করতে দিতেন না। তারপর রাজাকে বিশ্রাম করতে দিয়ে রাজার পালিত পশু পাখিগুলোকে নিজ হাতে পেট ভরে খাবার দিতেন। রাজার অনেকগুলো টিয়া, ময়না ও শুক-সারণ পাখি ছিল। সেগুলো রাণীর আদরে সকলেই বশীভূত হয়ে রাণীকে দেখলেই নানা প্রকার গান শুনাতো। তাছাড়া রাজার পালিত গরু-ছাগলগুলোকেও রাণী যত্ন করে খাবার দিতেন। এগুলো রাণীর আদর পেয়ে তাঁকে দেখলেই খুশী হয়ে

লেজ নাড়তো। রাজবাড়ীর সমস্ত দাসদাসীর খাওয়া হয়েছে কিনা সর্বদা খোঁজ খবর নিয়ে তবে রাণী নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে যেতেন।

রাজদরবার হতে রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেই রাণী অগ্রসর হয়ে নিতে আসবেন এবং নিজ হাতে রাজার পোষাক পরিচ্ছদ খুলে নিয়ে ঠিক জায়গায় রেখে দিয়ে রাজাকে বিশ্রাম করতে দিতেন। রাজার নিকটে বসে নানা কথাবার্তায় রাজার মনে আনন্দ দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। এসব দেখে রাজা রাণীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভালবাসায় নাম ধরেই ডাকতেন। একদিন রাজা বলছেন - "রাংচাক, তুমি কেন আমার জন্য এত প্রাণপাত পরিশ্রম করছো, তোমার কষ্ট হয় না?" রাণী সহাস্যে বললেন - "তুমিও যেমন, তোমার কাজ করতে আমার কষ্ট হবে কেন? তুমি বলেছিলে — আমার উপর যেমন তোমার দায়িত্ব আছে, তোমার উপরও আমার তেমনি দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্বপূর্ণ কাজ আমার করতেই হবে, তাতে কষ্ট হওয়ার কি আছে আমি জানি না।" রাজা বাধা দিয়ে বললেন — " না না, দাস দাসীরা আছে, তাদের দিয়ে তো অনেক কাজ করাতে পারো।" রাণী গম্ভীর হয়ে বললেন — "না না, তুমি বুঝবে না, এগুলো দাসদাসীর কর্ম নয়। তাদের কাজ তারা করেই যাচ্ছে। তোমার কাজেই যে আমার কাজ, সে কাজ আমি কেন পরের হাতে দিতে যাবো।" রাজা খুশী হয়ে রাণীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে বললেন — "আচ্ছা, তা হলে আমি চান করে আসি, তুমি খাবার তৈরী করে নাও।" রাণী বললেন — "হ্যাঁ, সব খাবার তৈরী হয়ে আছে, তুমি চান করে এসো।" রাজা অবাক হয়ে বললেন — "প্রিয়তমা রাংচাক, এরই মধ্যে তুমি সব তৈরী করে রাখলে। তুমি যে আমায় অবাক করলে!" বাস্তবিক রাণীর আচরণে তাঁর কাজকর্মে রাজা অন্তরে বড়ই তৃপ্তিবোধ করতে লাগলেন।

রাণী রাংচাকতির গুণে দাস দাসী সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো ও ভালবাসতো। রাণী সর্বদাই সকলের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করতেন। যেখানে যা করার প্রয়োজন হত সেখানে তাই করতেন। যেখানে যে ত্রুটি দেখতে পেতেন তা সংশোধন করে দিতেন। কি করলে রাজা সুখী হবেন, কি খেতে ভালবাসেন এগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে সেভাবে কাজ করতেন। খাওয়া দাওয়া শেষ করে

রাজা বিছানায় গেলে রাণী তাঁর শরীরে হাত বুলিয়ে পাখার বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়াতেন। রাজা ঘুমিয়ে পড়লে নীরবে নিজের কাজ করতেন। কাজ ছাড়া রাণী অনর্থক একটুখানি সময়ও নষ্ট করতেন না। চিরদিন বাপ-মার ঘরে কাজ করেই তার অভ্যাস। অন্যের অপেক্ষায় তিনি বসে থাকতেন না ; আলস্য কাকে বলে তা তাঁর জানা ছিল না। রাজরাণী হয়েছেন বলে পরের উপর নির্ভর করে চলার অভিপ্রায় তাঁর মোটেও ছিল না। এভাবে তিনি যেমন সেবা শুশ্রূষায় রাজার অন্তর জয় করে নিয়েছেন, সেরকম রাজার পালিত পশু পাখীদেরও পোষ মানিয়েছিলেন। রাণীর হাতের রান্না না হলে যেমন রাজা খেতে পারতেন না, তাঁর পশু-পাখীরাও রাণী নিজ হাতে খেতে না দিলে খেতে চাইত না। রাজাও রাণীকে না দেখে বেশী সময় থাকতে পারতেন না। রাজ দরবারে বসেও রাজা বার বার অন্তঃপুরে এসে রাণীর মুখ চেয়ে আনন্দ পেতেন এবং তাঁর হাতের পানের খিলি খেয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন। রাজা যেন রাংচাক ব্যতীত কিছুই জানতেন না। রাজার কোন কাজেই রাংচাক ছাড়া চলতো না। সব কিছুতেই তিনি যেন রাংচাকময় দেখতে পাচ্ছেন। রাণী রাংচাকতিও রাজা ভিন্ন আর কিছুই জানতেন না। রাজ দরবার হতে রাজা ফিরে আসতে দেরী হলে চঞ্চল হয়ে উঠতেন ; শত কাজে আবদ্ধ হলেও রাজার কথা একটি মুহূর্তও ভুলে থাকতে পারতেন না। এভাবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মাল।

দিন চলে যাচ্ছে। বিন্দুরাম হাজারী মেয়ের সুখে অন্তরে শান্তি বোধ করতে লাগলো। কিন্তু তার যাদুকরী পত্নী রাংচাকতির সুখ্যাতি শুনে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। মেয়ে রূফাই রাজরাণী হতে পারলো না বলেই বেশী জ্বালা। রাণী রাংচাকতির যতই সুনাম শুনতে লাগলো ততই সে কিভাবে তাঁর সুখের ঘর ভেঙ্গে দেবে তারই কথা ভাবতে লাগলো। হিংসায় জ্বলে জ্বলে সে প্রতিজ্ঞা করলো— "যদি আমি সতীনের মেয়ের অনিষ্টই করতে না পারি তাহলে আমার যাদুমন্ত্রের কি প্রয়োজন? আমার যাদুমন্ত্র শেখাই যে বৃথা। তার অনিষ্টই যদি করতে না পারি তবে যাদুমন্ত্র দিয়ে আমার কি হবে?" এসব কথা ভেবে চিন্তে সে একদিন তার স্বামীকে বললো— "এদ্দিন হয়ে গেল, রাংচাকতিকে দেখিনা।

তুমি একবার তাকে বাড়ীতে নিয়ে এস না গো। তার মা নেই বলে কি তাকে একবারও বাড়ীতে আনতে নেই? লোকে যে আমাকে দোষ দিচ্ছে। সৎমা বলে আমি নাকি রাংচাককে বাড়ীতে আনতে চাচ্ছি না। তাকে তো আমি তার মার মত স্নেহ দিয়েই বড় করে তুলেছি। সোমত্ত হয়ে স্বামীর ঘরে চলে গেল। সৎমা বলে মেয়েও তার বোনকে পর্যন্ত ভুলে গেল। তার মা নেই সত্য, তুমি বাপ তো এখনো আছ। কই সে তো তোমাকেও একটিবার দেখতে এলো না। সে যখন নিজে আসছে না, তুমিই না হয় একদিন নিমন্ত্রণ করে এনে খাইয়ে দাইয়ে দাও না কেন? তুমি পুরুষ মানুষ তোমাদের মায়া মমতা আমাদের মেয়েদের চেয়ে অনেক কম, তাই নিশ্চিন্তে থাকতে পারো। মেয়ে মানুষ হলে বুঝতে পারতে।" বিন্দুরাম হাজারী মায়াবীর কথায় অভিভূত হয়ে ভাবছে — বাস্তবিক, মা হারা আমার রাংচাক। অনেকদিন হল স্বামীর ঘরে চলে গেছে। তাকে একবার বাড়ীতে নিয়ে আসা দরকার। তারপর স্ত্রীর কথার উত্তর করলো — আমার মেয়ে হলে কি হবে, সে এখন রাজরাণী। রাজার আদেশ ছাড়া সে কেমন করে আমার মত সাধারণ লোকের ঘরে আসবে? রাজাই বা তার রাণীকে যেখানে-সেখানে আসতে দেবেন কেন? রাজরাণীকে স্থান দেওয়ার মত জায়গা কোথায়?" যাদুকরী স্ত্রী বললে — "বেশ তো, তুমি রাজার কাছে বলে কয়ে অন্ততঃ একবেলার জন্য হলেও আসতে বলোনা, তাতে রাজা নিশ্চয় রাজী হবেন। গরীব হলেও রাণীর বাপের কথা কি একটুও বিবেচনা করবেন না?" বিন্দুরাম বললো — " আচ্ছা, দেখা যাক, কাল রাজবাড়ীতে গিয়ে রাজার কাছে বলে দেখবো। যদি সম্মতি পাওয়া যায়তো নিয়ে আসা যাবে, আর না দিলে তো আনা যাবে না। তবে চেষ্টা করে দেখবো।" স্ত্রী খুশী হয়ে বললে — "হ্যাঁ আমিতো তাই বলছি গো।" বাপ-মা'র মমতাকে রাজা উপেক্ষা করবেন না বলেই মনে হচ্ছে।" বিন্দুরাম বললো — "কালই আমি যাবো, দেখা যাক রাজা কি বলেন। কিন্তু মুস্কিল কি জান, রাজ রাজার সাথে গরীবের কারবার, তাই তো মেয়েকে যখন-তখন আনা যায় না।" স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করে হাজারী রাংচাককে আনবার জন্যই স্থির করলো।

বিন্দুরাম হাজারী পরদিন রাজবাড়ীর পথে যাত্রা করলো। শেষ বেলাতে রাজবাড়ীতে গিয়ে পৌঁছল। রাজবাড়ীর প্রহরীর নিকট নিজের পরিচয় দিয়ে তার কন্যা রাণী রাংচাকের দেখা পাওয়ার জন্য জানালো। প্রহরী অন্তঃপুরে যাওয়ার অধিকারী বৃদ্ধ সেবকের কাছে হাজারীর আগমনের কথা জানালো। বৃদ্ধ সেবক হাজারীকে অপেক্ষা করতে বলে অন্তঃপুরে চলে গেল। রাজা ও রাণী বসে আলাপ করছেন, এমন সময় বৃদ্ধ সেবক হাজারীর আগমনের কথা রাজার নিকট আবেদন করলো। রাজা অন্তঃপুরে নিয়ে আসবার জন্য আদেশ করলেন এবং রাণীকে বললেন — "যাও রাণী, পাশের কোঠায় এনে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করোগে।"

বৃদ্ধ সেবক হাজারীকে সঙ্গে এনে পাশের কোঠায় বসতে দিলো। রাণী বহুদিন পর বাবাকে দেখে খুশী হয়ে প্রণাম করে বাড়ীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। হাজারীও অনেকদিন পর মেয়েকে দেখে খুশী হয়ে বাড়ীর কুশল খবর জানালো। তারপর কথায় কথায় বাড়ীতে নিয়ে যাবার কথা উত্থাপন করলো। রাণী একটু ভেবে বললেন — "মহারাজকে না জানিয়ে আমি তো বাবা তোমাকে কিছু বলতে পারছি না। আমি তাঁকে জানিয়ে তিনি কি বলেন তোমাকে জানাবো।" হাজারী বললো — " তা তো নিশ্চয় মা, মহারাজকে তো জানাতেই হবে। তা নাহলে তুমি কেমন করে যাবে ? ওদিকে তোমার মা ও তোমার দিদি তোমাকে দেখবার জন্য বার বার বলে পাঠিয়েছে।" রাণী মনে মনে চিন্তা করে বললেন — "আচ্ছা বাবা, তুমি বোস, আমি এ বিষয়ে মহারাজকে জিজ্ঞেস করে আসছি।"

রাজার নিকট রাণী বাড়ী যাওয়ার কথা বললেন। রাজা একথা শুনে একটুখানি বিরক্ত হয়ে বললেন — "না-না, রাণী, তোমাকে বাড়ীতে যেতে দেবো না। মাটি থেকে কুড়িয়ে ভাত খাওয়া, কাজ করতে দিয়ে খাঁটিয়ে মারা, তোমার হিতৈষী কচ্ছপকে মেরে খাওয়া, এগুলো নিশ্চয় তোমার মনে আছে।" রাণী বিমর্ষভাবে বললেন — "হ্যাঁ, আমার সবই মনে আছে। আমি তো ইচ্ছে করে যেতে চাচ্ছি না। আমাকে নিতে চাচ্ছে তাই তোমায় বললাম। তুমি যা বলবে

আমি তাই করবো।" রাজা একটু চিন্তিত হয়ে বললেন — "তোমার বাবা যখন নিতে চাচ্ছে তখন না পাঠালেও লোকে নানা কথা বলবে — তুমি যেতে পার। কিন্তু সেখানে বেশীক্ষণ থাকা উচিত হবে না।" রাণী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন — "না - না, আমি বেশীক্ষণ কিছুতেই থাকবো না। কিছু খাওয়া দাওয়া না করেই চলে আসবো।" রাজা বললেন — "তোমাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকা আমার সম্ভব নয়। একবেলার জন্য তুমি যেতে পারো, এর বেশী যেন না হয়।" রাণী সহাস্যে বললেন — "আমিই কি থাকতে পারি? তুমি যেতে বলছো বলে আমিও যেতে বাধ্য হচ্ছি।" তারপর বাবার নিকট সব কথা বললে বাবাও তাতেই রাজী হল।

যথাসময়ে রাণী প্রস্তুত হয়ে রাজার সহিত দেখা করে সরদার, জমাদার ও পাইক পেয়াদাসহ পাল্‌কীতে উঠে রওনা হলেন। রাণী সাধারণ বেশেই বাপের বাড়ীতে গিয়ে পৌছলেন। এদিকে যাদুকরী মা ও তার মেয়ে তাদের গোপন শলা-পরামর্শ অনুসারে অতিশয় ব্যস্ততার সঙ্গে রাণী রাংচাককে আদর করতে লাগলো। কোথায় রাখবে, কি খাওয়াবে তাই নিয়ে বড়ই ব্যস্ততা দেখাতে লাগলো। পাড়ার পরিচিত সকল মেয়েরা এসে রাংচাককে সম্মান দিয়ে দেখা করতে লাগলো। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সকলেই প্রশংসা করতে লাগলো। রাণী রাংচাক সকলের সংবাদই খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

এদিকে যাদুকরী সৎমা ও তার মেয়ে রাণী রাংচাকতির সহিত খুব আপনভাব দেখিয়ে হাসাহাসি করতে লাগলো। যাদুকরী স্ত্রী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে স্বামীকে ডেকে বলতে লাগলো — "রাণী মা এসেছে, তার লোকজনেরা এসেছে, বাজার থেকে মাছ-মাংস ও তরকারি আনতে হবে, তুমি শীঘ্র বাজারে যাও। বসে থাকলে চলবে ? এতদিন পর মেয়ে একবেলার জন্য এসেছে, তাকে একটু ভাল খাবার খাইয়ে দিতেও পারবো না?" রাণী রাংচাক ব্যস্ত হয়ে বললেন — "না মা, আমি কিছুই খাবো না, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। বেশী সময় নেই, আমাকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে।" সৎমা বাধা দিয়ে বললো — "একি কথা বলছিস মা, আর তো আসবি না। আর কবেই বা তোকে একটুখানি খাওয়াতে

পারবো ? এক বৎসর পর এসেছিস, একটুখানি খেয়ে না গেলে আমাদের চিরদিনের মত আক্ষেপ থেকে যাবে, কিছুতেই শান্তি পাবো না। না হয় তো একটু দেরী হবে তাতে মহারাজ এমন কি করবে ? মা বাপের ঘরে সামান্য দেরী হবে — তাতে আর কি হবে মা ? না খাইয়ে কেমন করে তোকে পাঠিয়ে দেবো, মন যে আমার মানছে না মা।"

হাজারী তাড়াতাড়ি বাজারে চলে গেল। রাজবাড়ীর লোকজনেরা বাইরে বসে বিশ্রাম করতে লাগলো। এদিকে যাদুকরী তার মেয়ে রূফাইতিকে নিয়ে রাণী রাংচাকতির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলো। একফাকে মেয়ে রূফাইতিকে যেভাবে প্রতাড়না করবার কৌশল শিখিয়ে রেখেছিল তা প্রয়োগ করবার জন্য ইসারা করে জানিয়ে দিলো। রূফাইতি তার ছোট বোন রাণীর অতি নিকটে বসে বলছে — 'রাংচাক, লক্ষী বোন আমার, তোর সুন্দর গয়নাগুলো আমাকে কিছুক্ষণের জন্য পরতে দিবি ভাই? আমি একটুখানি পরে দেখবো। তোর অনেক আছে, আমি তো কোনদিন এতগুলো গয়না চোখেও দেখিনি।" রাণী আপত্তি করে বললেন — "না-না- দিদি, ওগুলো গা থেকে খুলে দিতে পারবো না। মহারাজ শুনলে ভয়ানক বিরক্ত হবেন।" রূফাইতি তথাপি বার বার বলতে লাগলো — "এখনিতো আবার আমি ফিরিয়ে দেবো, রাজা জানতেও পারবে না।" সৎমাও কন্যার আব্দারে সায় দিয়ে বলছে — "দাও না মা, একটুখানি পড়ে তার মনের সাধ পুরিয়ে দেখুক।" রূফাইতি বিমর্ষ হয়ে অনুরাগ দিয়ে বলছে — "তুই রাজরাণী হয়ে আমাকে পর ভাবছিস বোন ; আমি তো তোর গয়না রেখে দেবো না। পরে দেখেই তো আবার খুলে দেবো।" সৎমা অতি কোমল স্বরে বললো — "রাংচাক, হতভাগীকে একটুখানি দে না মা, তার মনের সাধ মিটুক।" তাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে রাণী রাংচাক গয়নাগুলো খুলে দিতে বাধ্য হলেন। শেষপর্যন্ত তার শাড়ীটি পর্যন্ত চেয়ে নিলো। রাণী রাংচাক একটি ময়লা কাপড় পরে নিজের পরিহিত শাড়ীটিও পরতে দিলেন। এমনি করে রাণী রাংচাকতির বেশভূষা পাল্টে নিয়ে বড় বোন রূফাইতি রাণী সেজে বসলো। এদিকে যাদুকরী সৎমা একটি গোল টিকলী হাতে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে মন্ত্র

পড়ে রাণী রাংচাকতির কপালে বসিয়ে দিলো এবং টোকা মেরে দিলো। অমনি রাণী রাংচাকতি একটি ফিঙ্গে হয়ে উড়ে গেল। এবার যাদুকরী তার মেয়েকে রাণীরূপে পাল্কীতে তুলে দিয়ে সর্দার জমাদার প্রভৃতিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললো —"যাও, শীঘ্র নিয়ে যাও। মহারাজ হয় তো অপেক্ষা করে রয়েছেন।" সর্দার, জমাদার ও পাইকেরা কিছুই বুঝতে পারলো না। তারা রাণীই যাচ্ছেন বলে মনে করে নিয়ে চললো।

রাণীকে নিয়ে সর্দার, জমাদার প্রভৃতি রাজবাড়ীতে পৌছলে রাজা বৈঠকখানা হতে তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসে রাণীর অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাণী পাল্কী হতে বের হয়ে রাজাকে প্রণাম করলেন। রাণীকে দেখে রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন — "রাণী, তোমার শরীর এমন সাদা হল কেন? কিছুক্ষণের ভিতর তোমার এত পরিবর্তন হল কেমন করে? রাণী-রূপী রূফাইতি সহজভাবে উত্তর করলো — "কেন মহারাজ, আমার গায়ের রং তো ঠিকই আছে। আপনি কেন আমার পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না।" কথা বলার ভঙ্গী ও কন্ঠস্বর শুনে রাজার সন্দেহ হতে লাগলো। আমার রাণী রাংচাকতো আমাকে আপনি বলে কথা বলে না। তুমি বলেই আমার সাথে কথা বলতো। কি আশ্চর্য! এর মধ্যেই মানুষের কি এত পরিবর্তন হতে পারে? তাকি সম্ভব?" রাজা চিন্তিত হয়ে আবার বৈঠকখানায় চলে গেলেন। তারপর সর্দার, জমাদারকে ডেকে জিজ্ঞেস করছেন তোমরা রাণীকে ঠিকমত এনেছো তো ? রাণীর গায়ের রং সাদা হয়ে গেল কেমন করে? এত সাদা রং তো রাণীর ছিল না।" সর্দার, জমাদার ভীত হয়ে বলতে লাগলো — "মহারাজ, আমরা তো ঠিক মতোই রাণী-মাকে নিয়ে এসেছি। পাল্কীর ভিতরে গরমে বোধ হয় রাণী - মার গায়ের রং সাদা হয়ে থাকবে।" রাজা তাদের কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। মনে মনে অসহনীয় এক সন্দেহে দুলতে লাগলেন। আচ্ছা দেখা যাক, গায়ের রং পরিবর্তন হয় কি না।' রাজা অন্তঃপুরের পুরাতন দাসীদের বৈঠকখানায় ডেকে এনে রাণীকে আর একটি আলাদা ঘরে রাখবার জন্য বলে দিলেন। সকলকে বলে দিলেন — তার যেন কোন প্রকার অসুবিধা না হয় তার দিকে

লক্ষ্য রেখে কাজ করবার জন্য। দাসীরা রাণীকে অন্য একটি ঘরে থাকবার স্থান দেখিয়ে দিলো। তাতে রাণীর কাছ হতে কোনও আপত্তি উঠল না । দাসীরা রাজার খাওয়া দাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলে রাণী বলে দিলেন — "যেমন করে তোমরা রাজাকে খাওয়াচ্ছ সেভাবেই খাওয়াবে। আমার ভাল লাগছে না, আমি এখন আর কিছুই করতে পারবো না।" যা যা করতে হয় এখন থেকে তোমরাই করে যাবে। রাজা ভাবছে — দেখা যাক এর ভিতর কি রহস্য আছে। নিশ্চয় কোন অপদেবতা রাংচাকের রূপ ধরে আমার সাথে ছল করতে চাচ্ছে। এখন হঠাৎ কিছু করা কি ভাল হবে? তাতে কি রাংচাককে ফিরিয়ে পাওয়া যাবে ? রাজা দূরে থেকে রাণীকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। এভাবে দিনের পর দিন রাণীর চাল-চলন দেখে রাজার সন্দেহ বেড়েই চললো। দাস দাসীরাও রাণীর পরিবর্তন দেখে চুপি চুপি নানা কথা বলছে। মুখে কেউ কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। একদিন রাজা রাজদরবার হতে এসে বাটা হতে পান খেতে চাইলেন। কিন্তু একটি পানের খিলিও না পেয়ে বিরক্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন — "এ যে ভয়ানক অদ্ভূত লাগছে, এতো আমার রাংচাক নয়। আমার প্রতি তার একটু লক্ষ্য পর্যন্ত নেই। আমার পশু পাখিগুলো পর্যন্ত খেতে না পেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। রাণীতো এমন ছিল না । আমাকে নিকটে বসে যত্ন করে খাওয়াতো। কই, এখনতো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে, এর পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। রাণীর মুখের আকৃতি ও শরীরের গঠন কিছু কিছু মিলছে বটে, কিন্তু কন্ঠস্বর ও কথা বলার ধরণতো মিলছে না। এছাড়া আর কোন দিকেই রাণীর সঙ্গে মিলছে না।" চিন্তায় চিন্তায় রাজা পাগলের মত হয়ে গেলেন। খাওয়া দাওয়ার প্রতি লক্ষ্য নেই। তাই শরীর শুকিয়ে যেতে লাগলো। দাস দাসীরা যদিও নিয়মমত যার যার কাজ করে যাচ্ছে তথাপি রাণীর মত কেউ এত সুন্দরভাবে কিছুই করতে পারছে না। তারা ভয়ে ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারছে না । সকলেই রাণীর পরিবর্তন দেখে গোপনে গোপনে নানা কথা বলাবলি করতে লাগলো।

রাজা তাঁর প্রিয়তমা রাণী রাংচাকতির কথা ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন।

এই রাণী যে আমার রাংচাক নয় একথা সত্য। প্রিয়া রাংচাককে নিশ্চয় মেরে ফেলে কোন মায়াবী তার জায়গা অধিকার করবে বলে মনে করেছে। তা না হলে এরকম হবে কেন? এদিকে রাণীরূপী রূফাইতি নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে এসে কোথায় কোন জিনিষ থাকে, রাজা কেমন করে চলেন এসব কিছুই না জেনে কিছুই বলতে বা করতে সাহস পাচ্ছে না। জীবনে কোন কাজ না করে অলসভাবে বসে বসেই কাল কাটিয়েছে সে। যাদুকরী মার অতি আদরের দুলালী সে। একটি কাজও করতে জানতো না। রাজবাড়ীতে এসে ভয়ানক অসুবিধায় পড়ে গেল। রাণীর অভাবে পালিত পশু-পাখিগুলো দাস দাসীদের দেওয়া খাবার পেয়েও মর্মভেদী ডাক দিয়ে যেন কাঁদতে থাকে। রাজাও তাঁর রাণীর কথা ভেবে ভেবে পাখীদের কাছে গিয়ে দাঁড়ান শান্তি পাবার জন্য, কিন্তু তাদের অবস্থা দেখে আরও অশান্তিতে যেন বুক ফেটে যেতে চাইত। পাখীদের মুখে আর কোন বুলি নেই। তারাও যেন রাণীর বিচ্ছেদে নিঝুম হয়ে বসে থাকে। তারপর গরু - ছাগল, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদির কাছে গেলেন। সেখানেও যেন সকলেই বিষাদে আকুল। এ সকল দৃশ্য দেখে রাজা চোখের জল আর মানিয়ে রাখতে পারলেন না। নীরবে বসে প্রিয়তমা রাংচাকের কথা ভেবে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাণীরূপে আগতা নতুন রাণীর ধারে-কাছেও রাজা গেলেন না বা খোঁজও নিলেন না। রাজ দরবারে গিয়ে স্থির মনে কিছুই করতে পারছেন না। বিশ্বস্ত অমাত্যবর্গের নিকট রাজকার্যের ভার দিয়ে অবসর গ্রহণ করলেন। সারা রাজবাড়ীময় একটা বিরক্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হল।

এদিকে হাজারী বাজার হতে মাছ-মাংস ও ভাল ভাল তরকারী নিয়ে বাড়ীতে এসে রাণী রাংচাককে দেখতে না পেয়ে তাড়াতাড়ি তার স্ত্রীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো। যাদুকরী বেশ কৌশল করে বলছে — মহারাজ দেরী হয়েছে দেখে লোক পাঠিয়ে তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলেন। রূফাইতিকে রাংচাক কিছুদিন সঙ্গে রাখবে বলে তার সাথে নিয়ে গিয়েছে। হাজারী আক্ষেপ করে বলছে — আহা, এদ্দিন পর এলো, কিছুই খাওয়াতে পারলাম না। তারপর হাজারী আর কোন কথা বললো না।

রাজা কিন্তু রাণীর প্রতি অতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে লাগলেন। রাণীর গায়ের রংয়ের আর কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। মনে মনে ভাবছেন — আমার রাংচাকতো রাংচাকের মতই সোনার রং ছিল — ঠিক কাঁচা সোনার মত। রূপার মত তো আমার রাংচাকের রং ছিল না। এসব কথা ভেবে ভেবে রাজা নতুন রাণীর থাকবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন — আর বিশেষভাবে রাণীকে লক্ষ্য করছেন। এমন সময় এক কাল চকচকে ফিঙ্গে কাপড় শুকাবার দাংদালে বসে দিব্যি করুণ সুরে মানুষের মত বলছে —

"ফেচ্ছু ফেচ্ছু ছে ছে ছে বুবাগ্রা

নুয়াইজুক-ন নাঅয় নুখুং খালাইঅ

ফেচ্ছু ফেচ্ছু বুবাগ্রা নুংলে লাচিনানি ছিয়া

ছে ছে ছে।"

"বিহিক ব ছিয়া, আঁহিক ব ছিয়া

লাচিমা ব কুরই ছে ছে ছে।"

অর্থাৎ — মানুষের ভাষায় ফিঙ্গে বলছে — ছি ছি মহারাজ, তোমার স্ত্রীর বড় বোনকে নিয়ে সংসার করছো। একটু লজ্জাও করতে জান না। পরের স্ত্রী, নিজের স্ত্রীও জান না। লাজ-লজ্জাও করতে জান না ছি ছি ছি। রাজা হঠাৎ স্পষ্ট ভাষায় পাখীর মুখে এমন সুন্দর কথা উচ্চারিত হচ্ছে দেখে চমৎকৃত হয়ে ভাবছেন। রাণীরূপী রুফাইতি ছোট বোনকে ফিঙ্গে রূপে দেখে চিনতে পেরে রাজাকে ব্যস্তভাবে বলতে লাগলো — "মহারাজ, পাখীটাকে ধরে মেরে ফেলুন। ওটা যে আপনাকে মন্দ বলছে।" রাজা কোন কথা না বলে নীরবে উঠে বৈঠকখানায় চলে গেলেন। আর ভাবতে লাগলেন — "পাখীটা কেন যে এমন করে আমাকে বলছে — পাখী কেমন করে এসব কথা বলতে পারে। এতো

দেখছি খুব রহস্যজনক ব্যাপার। রাজা বৈঠকখানায় গিয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফিঙ্গেও উড়ে এসে বৈঠকখানায় জানালায় বসে ঐ কথাই বলতে লাগলো। পাখীর কথা শুনে রাজার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ সর্দার ও জমাদারকে ডেকে জিজ্ঞেস করছেন — "বিন্দুরাম হাজারীর কটি মেয়ে তোমরা বলতে পারো?" সর্দার ও জমাদার ভয়ে ভয়ে হাত জোড় করে বললো — "মহারাজ, আমরা যখন সোনার জুতা নিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়েছিলাম তখন দুটি কন্যা দেখেছিলাম। একজন সোনার রং আমাদের রাণীমা, আর একজন রূপার। সোনার জুতাটি সোনার রং আমাদের রাণীমার পায়েই লেগেছিল। রাজা তাদের বিদায় দিয়ে ভাবতে লাগলেন। অতীতের স্মৃতিগুলো আজ যেন রাজার কাছে সন্ধ্যাতারার মত একটি একটি করে ফুটে উঠছে। তিক্ত বিষাদে রাজার মন কানায় কানায় ভরে উঠল। তিনি ভাবছেন পাখীটিই হয়ত আমাকে ঠিক নির্দেশ দিয়ে গেল। এর ভিতর একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছি। এখন হঠাৎ যদি কিছু করে বসি তাহলে কি আমার রাংচাককে ফিরে পাবো ? ধৈর্য ধরে করতে হবে এ সমস্যার সমাধান। এর পরিণতি কোথায় গিয়ে শেষ হবে জানি না।

একদিন রাজা দরবারে বসে রাজকার্য দেখছেন, এমন সময় ফিঙ্গেটি স্পষ্ট ভাষায় সেই একই কথা বলতে লাগলো। পাত্র মিত্র সকলেই অবাক হয়ে মাথা নীচু করে রইল। রাজা লজ্জায় মর্মাহত হয়ে রাজ দরবার হতে নীরবে অন্তঃপুরে চলে গেলেন। পাখীর স্পষ্টবাদিতায় সকলেই কৌতুহল প্রকাশ করতে লাগলো।

পরের দিন মনের দুশ্চিন্তা ঢাকবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন শিকারীকে সঙ্গে নিয়ে রাজা বনে গেলেন। শিকারে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। শুধু বনে বনে নীরবে ঘুরতে লাগলেন। এমন সময় সেই ফিঙ্গেটি রাজার পাশে পাশে উড়ে ঐ একই কথা বলে তাঁর অন্তরে ব্যাথা দিতে লাগলো। রাজা মনের দুঃখে রাগান্বিত হয়ে সর্দার ও জমাদারকে জাল পেতে ফিঙ্গেটিকে ধরবার জন্য আদেশ দিলেন। যথাসময়ে রাজবাড়ীর লোকেরা ফিঙ্গেটিকে ধরে রাজার নিকট নিয়ে এলো। রাজা সর্দারকে বলে দিলেন — পাখীটাকে খাঁচায় পুরে রাখ। সাবধান, কোন প্রকারে যেন ছুটে না যায় ; কোন প্রকার অযত্নও যেন না হয়। সর্দার পাখীটাকে

তার স্ত্রীর নিকট বুঝিয়ে দিয়ে ভালভাবে যত্ন করে রাখবার জন্য রাজার আদেশ জানিয়ে দিলো। সর্দারের স্ত্রী প্রত্যেকদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে চান করিয়ে রীতিমত খাবার দিয়ে পোষতে লাগলো। সব সময় সর্দারের শিয়রে খাঁচাটি টাঙিয়ে রাখা হত। ফিঙ্গে সব সময়ই সর্দারের স্ত্রী সীতালক্ষীকে বলতো —

"ফেচ্ছু ফেচ্ছু সীতালক্ষী আ-ন ঈয়াকারয় রুদি।"

অর্থাৎ - সীতালক্ষী আমাকে ছেড়ে দাও।

এদিকে রাজা দিন দিন চিন্তা ভাবনায় চান-খাওয়া একপ্রকার ছেড়েই দিলেন। রাজবাড়ীর চারদিকেই একটা বিশৃঙ্খলা দেখা যেতে লাগলো। পোষা পশু-পাখিগুলো অযত্নে ছন্নছাড়া ভাব ধরল। রাজার অবস্থা দেখে দাসদাসী, পাত্রমিত্র সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লো। রাজার মনের কথা কেউ জানতে পারছে না। অথচ ভয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস পাচ্ছে না। দুঃখের দিনগুলো চলে যেতে লাগলো। একদিন সর্দারের স্ত্রী পাখীটাকে চান করাতে গিয়ে পাখীর মাথার গোল টিকলিটি দেখল। সে আস্তে আস্তে টিকলিটি খুলে ফেলে দিলো। টিকলিটি উঠিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যময়ী এক যুবতী ময়লা কাপড় পরে তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে দাঁড়াল। সর্দারের স্ত্রী ভয়ে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল। তার অবস্থা দেখে রাণী রাংচাক বলছেন — তুই অবাক হয়ে কি দেখছিস? আমাকে চিনতে পারছিস না? রাণীর কথা ও মিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনে সর্দারের স্ত্রী তাড়াতাড়ি পায়ে পড়ে প্রণাম করলো। রাণী প্রথমেই সীতালক্ষীকে রাজার কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। সর্দারের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে রাজার অবস্থা ও পশু-পাখি ইত্যাদি সকলের কথা একে একে বলতে লাগলো। স্বামী গত প্রাণা রাণী তাঁর স্বামীর কষ্টের কথা শুনে বসে বসে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তারপর সর্দারের স্ত্রী সীতালক্ষীকে আদর করে বললেন — দেখ সীতালক্ষী, আমি যে আবার মানুষ হয়েছি একথা কারো কাছে এখন বলবি না। সাবধান, মহারাজও যেন জানতে না পারেন। আমার বড় বোন তার ছোট বোনের স্বামীকে নিয়ে সুখী হতে চেয়েছে। তার সুখ আমি ভঙ্গ করতে চাই না। আমি এখন লুকিয়ে লুকিয়ে থাকবো। তারা জানতে পারলে আবার আমার ভয়ানক বিপদ ঘটবে, তাই তোকে

বলে রাখলাম। সীতালক্ষী বললো — ওমা ! এ সাদা রাণী কি আপনার বড় বোন রাণী মা ! মহারাজ তো তার দিকে চোখ তুলেও চাইছেন না। তাঁকে নিয়ে ঘর করা তো দূরের কথা। তাঁর ধারে কাছেও তিনি যান নি। মহারাজও বোধ হয় তাঁকে চিনতে পেরেছেন, তিনি যে আপনি নন। এদিকে সর্দার ঘরে এসে রাণী মাকে ময়লা কাপড় পরে কাঁদতে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তার চৈতন্য ফিরে আসলে সে ভক্তিভরে রাণীকে প্রণাম করে দাঁড়ালো। রাণী চোখের জল মুছে সর্দারকে বললেন — সর্দার, আমার কথা এখন কারো কাছে একটুকুও বলবে না। সময়মত আমি সব বলবো। রাজ অন্তঃপুরের সব ভান্ডার গৃহের চাবি সর্দারের হাতেই থাকতো। তাই রাণী তাকে বলে দিলেন — যে সব ঘরে আমি সর্বদা কাজকর্ম করতাম, তুমি সে সব ঘরের তালায় চাবি দিয়ো না। মহারাজের শয়ন ঘরের দরজায়ও চাবি দিয়ো না। আমি আগের মতই প্রত্যেকটি কাজ গোপনে গোপনে করে যাবো। সাবধান, কোন দাস দাসীকেও একথা কখনও বলবে না। আমার কথা যেন রাজা বা অন্য কেউ কিছুই জানতে না পারে। সর্দার কোন কিছু প্রকাশ না করে রাণীর আদেশ মত কাজ করবে বলে স্বীকার করে নিলো। সীতালক্ষীকে বললেন — যাও সীতালক্ষী, আমার ঘর হতে কতগুলো ভাল ভাল কাপড় চোপড় নিয়ে এসো। আমি কাপড় বদলিয়ে নেবো। সীতালক্ষী তৎক্ষণাৎ গিয়ে রাণী মার ঘর থেকে কতগুলো কাপড় এনে দিলো। রাণীমা পুরাতন কাপড়টি ছেড়ে দিয়ে একটি ভাল কাপড় পরে নিলেন। তারপর রাজ অন্তঃপুরের নিভৃতে রাজ ভান্ডারের সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে অতি গোপনে থাকতে লাগলেন। সীতালক্ষী গোপনে গোপনে রাণী মার সাহায্য করতে লাগলো। রাজা অন্তঃপুরে আসবার আগেই রাণী গোপনে রান্না ঘরে ঢুকে রাজা যা যা খেতে ভালবাসতেন তাই রান্না করে আগের মত থাল সাজিয়ে রাখতে লাগলেন। রাণীর এসব বিষয়ে কোন প্রকার অসুবিধা ছিল না। সকল কিছুই তাঁর জানা ছিল। তাই তিনি আগের মতই সব কাজ করে সোনার থালায় খাবার সাজিয়ে যত্ন করে রাখলেন। তারপর রাজার শোবার ঘরে গিয়ে বিছানা পরিষ্কার করে পেতে দিয়ে সোনার বাটায় পানের খিলি সাজিয়ে রেখে নিজে এক খিলি পান খেয়ে রাজার পরবার ধূতিতে মুখ মুছে পানের পিক লাগিয়ে দিয়ে ঘর হতে

বেরিয়ে এলেন। যথাসময়ে রাজা অন্তঃপুরে এসে খাবার ঘরে গিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবছেন — কি আশ্চর্য, আমার কি মাথা খারাপ হল না কি ! আগে রাংচাক আমাকে যেভাবে যত্ন করে থাল সাজিয়ে খেতে দিতো, ঠিক সেভাবেই যে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তারপর খেতে বসে খাবার খেয়েও রাংচাকের হাতের রান্নার পরিচয় পেয়ে ভাবতে লাগলেন — আমার রাংচাক কি তাহলে ফিরে এসেছে? না অতি কল্পনায় আমি এগুলো অনুভব করছি। নানাকথা ভাবতে ভাবতে রাজা খাওয়া শেষ করে শোবার ঘরে গিয়ে বিছানা ঠিক আগের মতই সাজানো দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন। বাটা খুলে দেখতে পেলেন ঠিক রাংচাক যেভাবে সুন্দর পানের খিলি তৈরী করে রাখতো সেভাবে খিলি দিয়ে বাটা ভরে রাখা হয়েছে। রাজা এসব ব্যাপার দেখে রাংচাকের কথা ভাবতে ভাবতে অস্থির হচ্ছেন। রাণী রাংচাক পোষা পশু-পাখিগুলোকেও আদর করে খাইয়ে দিতে লাগলেন। এদ্দিন পর তাদের পরিচিত হাতের খাবার পেয়ে তারাও পেট ভরে খেয়ে নিলো।

রাজা পান খেয়ে বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে ভাবতে লাগলেন — এদ্দিন পর রাংচাকের হাতের রান্না খেয়ে যেন তৃপ্তি পেলাম। এ আমার রাংচাকের কর্ম ভিন্ন আর কারো নয়। দুঃসহ যন্ত্রণায় রাজার মুখ থেকে বেরিয়ে এল — উঃ রাংচাক আমার, তোমার বিচ্ছেদ জ্বালায় আমার প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে। রাংচাক আমার, প্রিয়া আমার, তাহলে তুমি ঠিকই এসেছো। কিন্তু আমার সাথে কেন দেখা দিচ্ছ না। সেই মুহূর্তে একটা মধুর আবেগে রাজার হৃদয়-মন ভরে গেল। আশা আনন্দে অস্থির হয়ে এক মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন রাজা। একসময়ে রাজা প্রিয়তমার কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষরাতে রাজা পাখীদের সুমিষ্ট গান শুনে তাড়াতাড়ি বিছানা হতে উঠে দেখতে গেলেন। এতদিন পাখীগুলো চুপচাপ ছিল, গান গায়নি একটুও। আজ হঠাৎ করে তাদের গান শুনেই রাজা কৌতুহলী হয়ে দেখতে গেলেন। চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছেন। পাখীগুলো বেশ স্বাভাবিকভাবেই যে যার গান গাইছে। নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। রাজা ভাবতে লাগলেন — নিশ্চয় রাংচাক এসে এগুলোকে খাবার খাইয়ে

দিয়েছে। তা না হলে আজ তাদের এত আনন্দ কেন ? এভাবে রাজা ভেবে ভেবে হাঁটছেন হঠাৎ পায়ে একটি হোচট খেয়ে নীচের দিকে লক্ষ্য করতেই পরিষ্কার ধুতিতে রক্ত লেগে রয়েছে দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবছেন — একি আমার কাপড়ে এ কিসের রক্ত! চিন্তিত হয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে সর্দারকে বললেন — সর্দার, দেখতো, আমার কাপড়ে রক্তের মত কি লেগেছে। রাজা — কোথা হতে আমার কাপড়ে পানের পিক্ লাগলো? তোমরা রাজ বাড়ীতে কোন একজন স্ত্রীলোককে আসতে দেখেছ কি ? সকলেই অবাক হয়ে উত্তর করলো — না, না, মহারাজ, আমরা তো কাউকে রাজ অন্তঃপুরে আসতে দেখি নি। প্রহরীদেরও ডেকে রাজা জিজ্ঞেস করলেন। কেউ কিছু বলতে পারলো না। আমার কাপড়ে কে পানের পিক মুছে দিয়েছে, তোমরা কেউ দেখনি ? আমার শোবার ঘরে কোন নারীকে ঢুকতে দেখনি ? সকলেই দেখিনি বলে জানালো। রাজা সকলকে বিদায় দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

এভাবে দিনের পর দিন যাচ্ছে রাজা চিন্তা-ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠলেন। প্রিয়তমা রাংচাকের আদর-যত্ন যেন রীতিমতই পেতে লাগলেন। কিন্তু কোনমতেই তার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। একদিন রাজা ঘুম হতে উঠে দেখতে পেলেন বিছানায় পানের পিকে ভরে রয়েছে। তা দেখে তিনি মনে মনে স্থির করলেন আজ রাতে যেমন করেই হোক কে এমনটা করছে দেখতে হবে। এভাবে রোজ রাতে ধরবো ধরবো মনে করি, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ি বলে ধরতে পারি না। আজ যাতে ঘুম না আসে তার ব্যবস্থা করতেই হবে। আজ যে করেই হোক এ রহস্যের সমাধান করবোই এই বলে রাজা প্রতিজ্ঞা করলেন। এভাবে সাতদিন হয়ে গেল, রাংচাকের কোন সংবাদই না পেয়ে রাজা বড়ই দুর্বহ জীবন ভোগ করতে লাগলেন। রাত্তিরে রাংচাকের সাজানো খাবার খেয়ে, পান চিবোতে চিবোতে একখানা ছুড়ি হাতে নিয়ে নিজের আঙ্গুলে সামান্য ক্ষত করে নুন জল লাগিয়ে একখানা পাতলা চাদর দিয়ে সারা গা ঢেকে চোখ বুজে বিছানায় পড়ে রইলেন। কাটা ঘায়ের জ্বালায় ঘুমও আসছে না। এ সবকিছুই সহ্য করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রত্যেকটি মুহূর্ত রাজাকে দুলিয়ে দিচ্ছে অন্তহীন ছলনায় আর অনন্ত

আশ্বাসে।

গভীর রাতে রাজার শোবার ঘরে মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে রাজা কান পেতে রইলেন। এদিকে রাণী রাংচাক সন্তর্পণে শোবার ঘরে ঢুকে বাটা হাতে একখিলি পান খেয়ে স্বামীর প্রতি সকরুণ দৃষ্টিতে চাইতে লাগলেন। তারপর সন্তর্পণে রাজার পায়ের কাছে বসে নীরবে কাঁদতে লাগলেন। খানিক পরে মুখের পানের পিক রাজার পরা কাপড়ে যেমনি মুছতে যাবেন অমনি রাজা রাংচাককে জড়িয়ে ধরলেন। ধরার সাথে সাথে রাংচাক বলতে লাগলেন —

"ছে ছে ছে বুবাগ্রা আ-ন ইয়াকারদি, ইয়াকারদি,
নিহীক বা ন-গ-ন তঙ্গ, আ-ন তমানি রমখা ?
নুং লাচিয়া দে — ছে বুবাগ্রা ছে নুং লে আহাই তা
অংদি।"

অর্থাৎ — ছি ছি মহারাজ, আমায় ছেড়ে দাও, তোমার স্ত্রী তো ঘরেই আছে। আমায় কেন ধরছো, তোমার লজ্জা করছে না — এরূপ হয়োনা ছি ছি।

রাণীর সুমিষ্ট কন্ঠস্বর এতদিন পর শুনতে পেয়ে রাজা আরও শক্ত করে তাকে বুকে চেপে ধরলেন। আবেগে অস্থির হয়ে বলতে লাগলেন — রাংচাক তুমি আমার প্রাণ, তুমি কেমন করে এদ্দিন আমাকে ভুলে রইলে ? এদ্দিন, তোমার অভাবে আমার দিন যে কাটতে চাইছিল না। নিদারুণ বিরহ যন্ত্রণায় দিন রাত কেবল তোমার কথাই ভাবছি। রাজা ব্যস্ত হয়ে বললেন — তুমি যে কথা আমাকে বলছ তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তুমি ভুল বুঝ না প্রিয়া, আমি যে তুমি ছাড়া অন্য কোন নারীর প্রতি চোখ তুলেও চাই নি। তুমি ভুল বুঝ না লক্ষী আমার। রাংচাক আমার, তোমাকে ছাড়া আমার দিনগুলো যে কিভাবে যাচ্ছে তা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। রাণী অভিমানে কান্নার সুরে বললেন মহারাজ, তুমি যে এখন আমার বড় বোনের স্বামী। আমাকে নিয়ে তুমি যে আর সুখী হতে পারবে না। আমি অনর্থক এসে বড় বোনের প্রাণে আঘাত দিতে চাই না। রাণী কেঁদে

কেঁদে বলতে লাগলেন — মহারাজ, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি চিরদুঃখিনী, যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকেই চলে যাবো। আমি তোমার কাছে থাকলেই দিদির প্রাণে ভয়ানক আঘাত লাগবে। সতীনের যে কি জ্বালা তা আমি শিশুকাল থেকেই বুঝতে পেরেছি। রাজা আকুল হয়ে রাণীকে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝাতে লাগলেন — না না, রাংচাক, তুমি ভুল বুঝ না। তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমি কেমন করে বুক ভরা শূন্য নিয়ে থাকবো ? তোমার বোনের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। সে কে তাকে আমি চিনিও না। তাকে তুমি ভয় করছো কেন ? তাকে আমি দূর করে দেবো। কোনমতেই তাকে এখানে থাকতে দিচ্ছিনা , তুমি তা জেনে রেখো। আচ্ছা, আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করছি — তুমি একবেলার জন্য বাপের বাড়ীতে গিয়ে আর ফিরে এলে না, তোমার বোনকে গয়না পরিয়ে সাজিয়ে পাঠালে কেন? আমাকে সত্যি করে বল? আমি এ রহসোর কথা শুনতে চাই। রাণী আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে রাজার বুকে মাথা রেখে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত সকল কথা বলতে লাগলেন। সর্দারের স্ত্রী সীতালক্ষীর কৃপায়ই সে ফিঙ্গে হতে মুক্তি লাভ করেছেন একথাও রাজাকে বলে শুনালেন। রাজা তো এসকল কথা শুনে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। নিজের কাপড় দিয়ে রাণীর চোখের জল মুছে দিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি এর প্রতিকার কেমন করে করছি দেখতে পাবে। আমার ভালবাসার ধন রাংচাককে যে এত কষ্ট দিয়েছে, আমার হাতে তার রক্ষা নেই। রাণী বললেন — মহারাজ, আমি লুকিয়ে চলবো, দিদির সাথেও দেখা করবো না। কি জানি — আমাকে আবার ওরা কি করে ফেলে ! ফিঙ্গে হয়ে যে কত কষ্টই না পেয়েছি ! রাজা বললেন — আচ্ছা, তাই করো। আমি তোমার বাবা ও সৎমাকে নিয়ে আসবার জন্য এক্ষুণি লোক পাঠাচ্ছি। তোমার মায়াবী সৎমাকে তার উচিত শাস্তি পেতেই হবে। এর প্রতিশোধ যেমন করে দিতে হয় আমি দেবো। রাণী রাংচাক ব্যস্ত হয়ে বললেন — না না মহারাজ, বাবাতো সরল মানুষ। তিনি এ বিষয়ে তো কিছুই জানেন না। বাবাকে অনর্থক শাস্তি দিয়ো না। রাজা বাধা দিয়ে বললেন — না তোমার বাবাকে নয়, তোমার মায়াবী সৎমাকে তার কৃতকর্মের ফল পেতেই হবে। রাণী বিমর্ষ হয়ে বললেন — মহারাজ, সৎমাকেও

আমার জন্য শাস্তি দিয়ো না। তাঁর কাজ তিনি করেছেন, তাই বলে তার প্রতিশোধ নিয়ে কি হবে ? এখন হতে তাঁদের সঙ্গে আর কোনপ্রকার সম্পর্ক রাখবো না। তাহলে হয় তো আর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। রাজা বললেন — বল কি রাংচাক ? তোমার এত বড় অনিষ্ট করেছে, আর আমি তাই সয়ে যাব তা কখনও হবে না। আমি রাজা, রাজধর্ম আমার পালন করতেই হবে। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করতেই হবে। এর অন্যথা হবে না। তোমাকে ফিঙ্গে করে দিল। সে ফিঙ্গে তো যেকোন সময় মানুষের হাতে প্রাণ হারাতে পারতো। রাণী ব্যস্ত হয়ে বললেন — হ্যাঁ মহারাজ, ফিঙ্গে হয়ে আমি যে কষ্ট ভোগ করেছি তা তোমাকে বলে বুঝাতে পারবো না। তারা আমায় মানুষ বলে চিনতে পেরে আমার সাথে মিশতো না। সকলে ভয়ে ভয়ে আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতো। সব সময় একা একা বনে বনে ঘুরেছি। কথাও বলতে পারি না। অনেক কষ্টে দু'একটি কথা বলতে পারতাম। তাই ফিঙ্গে হয়ে তোমাকে মন্দ কথা বলেছিলাম — এই বলে রাণী হাসতে লাগলেন। রাজা চিন্তিত হয়ে বললেন — বাস্তবিক রাংচাক, আমি ইচ্ছা করলে তখন তোমাকে মেরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু পশু-পাখীর প্রতি আমার ভয়ানক মমত্ব আছে বলে মারতে পারি নি। বরঞ্চ ফিঙ্গেরূপী তোমার কথা শুনে তোমার কথাই বার বার মনে হয়েছে। ফিঙ্গেটিকেও তাই সর্দারকে যত্ন করে পোষতে বলেছিলাম। খুব মায়া করেছিলাম। এখন তুমি বলছো তোমার সৎমাকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করতে। রাণী বললেন — তুমি যদি আমাকে ধরতে আমি নিজেই তোমার কাছে ধরা দিতাম। তোমাকে দেখে দেখে আমার বুক ফেটে যেতে চাইত। তাই তো তোমার পাশে পাশে উড়ে বেড়াতাম। কত কথা বলতে চাইতাম, কিন্তু পারতাম না। মানুষের মত জ্ঞানও বেশী থাকতো না। অস্পষ্ট সময় সময় জ্ঞান হত। তাও বেশীক্ষণ থাকতো না। কি দুর্বহ জীবনই না কাটিয়েছি! এদ্দিন পর রাণী রাংচাককে পেয়ে রাজা পরম আনন্দে রাত কাটলেন। রাণীকে পেয়ে রাজার মন আবার আনন্দে ভরে উঠলো। রাত ভোর হলে রাণী লুকিয়ে লুকিয়ে চলতে লাগলেন। রাজা বৈঠকখানায় গিয়ে সর্দার ও জমাদারকে ডেকে বিন্দুরাম হাজারী ও তার স্ত্রীকে আনবার জন্য আদেশ দিলেন।

যথাসময়ে বিন্দুরাম হাজারী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। হাজারীকে বাইরে বসিয়ে রেখে তার স্ত্রীকে রাজঅন্তঃপুরে রূফাইতির কোঠায় নিয়ে যাওয়া হল। অনেকদিন পর মেয়েকে দেখে খুশী হয়ে যাদুকরী অতি নিচু গলায় ফিস ফিস করে কথা বলতে লাগলো। রাজা সর্দার ও জমাদারকে নিয়ে রূফাইতির ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। রাজাকে দেখে রূফাইতির মা উঠে দাঁড়ালো। রাজা ভয়ানক রাগান্বিত হয়ে রূফাইতির হাতে ধরে, মুখ চোখ লাল করে কঠিন স্বরে বললেন — আজ তোর মার চোখের সামনে তোকে কেটে ফেলবো। দেখি তোর মায়াবী মা আমাকে কি করতে পারে! খাপ হতে তরবারি টেনে বের করে নিলেন। এমন সময় তার মা ব্যস্ত হয়ে হাত জোড় করে কাতর স্বরে অনুনয় করে কাঁদতে কাঁদতে বলছে — মহারাজ, ধর্মাবতার রক্ষা করুন, কি অপরাধে আমার মেয়েকে কাটতে চাচ্ছেন ? রাজা খুব উত্তেজিত হয়ে মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে তার মাকে ধরে তরবারি উঠালে রূফাইতি অস্থির হয়ে মার কাছে আসতে চাইলে সর্দার ও জমাদার তাকে ধরে রাখলো। তার মাকে ধরে রাজা বলতে লাগলেন — তোকে আজ তরবারি দিয়ে কাটবো না। কিন্তু তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে মারবো। সর্দারকে বললেন — যাও সর্দার, বেত নিয়ে এসো। তাকে বেত দিয়ে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলতে হবে। আগেই বেতে তেল মেখে রাখা হয়েছিল। বেত আনা হলে জমাদারকে বেত্রাঘাত করবার জন্য আদেশ দিলেন। জমাদার আদেশ অনুযায়ী বেত্রাঘাত করতে লাগলো। রাজা উত্তেজিত হয়ে বলছেন — বল, রাংচাক কোথায়? কি হয়েছে তার বল। যাদুকরী মার খেতে খেতে রূফাইতিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। রাজা আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন — আবার মিথ্যা কথা বলছিস। বল, সত্য কথা বল, আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে রেহাই পাবিনা। জমাদার আবার বেত্রাঘাত চালাতে লাগলো।

মা'র এরূপ মর্মান্তিক শাস্তি দেখে রূফাইতি সহ্য করতে না পেরে কেঁদে কেঁদে বলছে — মা, তুমি মিথ্যা কথা বলছো কেন? রাংচাককে ফিঙ্গে করেছ একথা বল মা। মা'র কষ্ট রূফাইতির কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। আবার বলছে

সত্য কথা বলে দাও মা, তোমাকে আর কোন শাস্তি দেবেন না। তথাপি যাদুকরী মেয়ের কথা শুনে বিরক্তি প্রকাশ করে বলছে — আমি তো সত্য কথাই বলছি, তুই সত্য মিথ্যার কি জানিস ?

যাদুকরীর কথা শুনে রাজা রেগে আগুন হয়ে সর্দারকে মন কাঁটার ডাল নিয়ে আসবার জন্য আদেশ করলেন। মন কাঁটার ডাল আনা হলে জমাদারকে বেত রেখে দিয়ে মন কাঁটার ডাল দিয়ে পেটাবার জন্য বললেন। নাও জমাদার, মনের ডাল দিয়ে আচ্ছা করে পেটাও। দেখি সে কেমন করে মিথ্যা কথা বলে রক্ষা পায়। জমাদার মারতে মারতে জর্জরিত করে ফেললো। গা দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। রাজা বার বার জিজ্ঞেস করছেন — বল রাংচাক কোথায়, তাকে কি করেছিস! তবুও যাদুকরী রূফাইতিকেই আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলছে — ওই রাংচাক। এত মার খেয়েও যাদুকরী কিছুতেই দমছে না। এত মার দিয়েও তার মুখ থেকে সত্য কথা বের করা গেল না। রাজা একটুখানি ভেবে নেয় তার মেয়েকে এভাবে বেত্রাঘাত করতে হবে। তার সামনে তার মেয়েকে মারলেই সে সত্য কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হবে। এই ভেবে রাজা বিন্দুরাম হাজারীকে অন্তঃপুরে নিয়ে আসবার জন্য বলে দিলেন। হাজারীকে নিয়ে সর্দার উপস্থিত হলে রাজা উত্তেজিত হয়ে হাজারীকে বলছেন হাজারী, তোমার ক'টি মেয়ে ? হাজারী রাজাকে প্রণাম করে ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো — মহারাজ, আমার দু'টি মেয়ে। রাজা গম্ভীর হয়ে রূফাইতিকে দেখিয়ে বললেন — ওর নাম কি রাংচাক ? হাজারী ব্যস্ত হয়ে বললো — না মহারাজ, ওর নাম রাংচাক নয়। ও আমার বড় মেয়ে রূফাই। রাজা উত্তেজিত হয়ে বললেন — তা হলে তোমার ছোট মেয়ে রাংচাক কোথায়? তোমার বাড়ীতে একবেলার জন্য তাকে নিয়েছিলে, আর প্রতারণা করে তোমার বড় মেয়েকে রাণী সাজিয়ে পাঠিয়েছ। রাংচাক গেল কোথায়, আজ আমাকে বলতে হবে। হাজারী ভয়ে কেঁদে কেঁদে বলছে — মহারাজ, ধর্মাবতার, আপনি মেরে ফেলুন, কিংবা কেটেই ফেলুন এর বেশী আমি আর কিছুই জানিনা। রাজা বলছেন — তাহলে রাংচাকের কি হল? কোথায় গেল সে কিছুই জান না? তোমার যাদুকরী স্ত্রী তোমাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে।

তুমি আর জানবে কি? হাজারী কেঁদে কেঁদে বলছে — মহারাজ, আমি যে আর কিছুই বলতে পারবো না। রাজা তাকে বারান্দায় গিয়ে বসে থাকবার জন্য বলে দিলেন। হাজারী বারান্দায় বসে দুশ্চিন্তায় অন্ধকার দেখতে লাগলো।

এদিকে যাদুকরী ভয়ানক মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তার জ্ঞান ফিরলে রাজা ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন — বল রাংচাক কোথায়? কিন্তু সে কোন উত্তর করলো না। তারপর রাজা তার মেয়ে রূফাইতিকে বেত্রাঘাত করবার জন্য আদেশ করলেন। সর্দার রূফাইতিকে বেত্রাঘাত করতে আরম্ভ করলো। মেয়ের কাতর কান্নায় তার মা অসহ্য বোধ করে ছটফট করতে লাগলো। রূফাইতির গা বেয়ে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রূফাইতি মাকে গাল দিয়ে বলতে লাগলো — তুমি মা নও, তুমি রাক্ষসী-ডাইনী-যাদুকরী। তুমি সত্য কথা বলছো না বলেই আমি অনর্থক এত যন্ত্রণা পাচ্ছি। তুমি যা করেছ স্বীকার করে নাও না কেন? তোমার মত যাদুকরী মার জন্যই আমি অনর্থক এত মার খাচ্ছি। এদিকে হাজারী মেয়ের বুক ফাটা কান্না শুনে মাথা নীচু করে চোখের জল ফেলতে লাগলো আর কান পেতে শুনছে ওরা কি বলাবলি করছে।

মেয়ের কষ্ট দেখে তার মা আর সহ্য করতে পারলো না। এতক্ষণ নিজে মাথা পেতে কঠোর সাজা নিয়েও সত্য গোপন করে রেখেছিল। কিন্তু মেয়ের যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে হাত জোড় করে বলতে লাগলো — মহারাজ ধর্মাবতার, আমি সকল কথা বলছি। আমার মেয়েকে দয়া করে আর মারবেন না। রাজা রাগত স্বরে বললেন — বল শীঘ্র বল। তা না হলে আজ তোদের দুটোরই প্রাণ যাবে। রাজা মারধোর বন্ধ করতে বলে নীরবে শুনতে লাগলেন। হাজারীর স্ত্রী বলতে লাগলো — রাংচাককে আমি ফিঙ্গে করে উড়িয়ে দিয়েছি মহারাজ। রাজা বললেন — তাহলে ফিঙ্গেটি কোথায় আছে? জানি না মহারাজ — বলে সে চুপ করলো। রাজা বললেন — হ্যাঁ, একদিন সে ফিঙ্গে উড়ে এসে মানুষের ভাষায় কথা বলেছিল। তাকে দেখেই তোর মেয়ে পাখীটাকে মেরে ফেলবার জন্য বলেছিল। ভাগ্যিস, আমি মারি নি। কিন্তু কোথায় উড়ে গেল তোর মেয়ে নিশ্চয়

এ সম্বন্ধে কিছু জানে। রাণী হবার লোভে ছোট বোনকে ফিঙ্গে করে দেওয়া হয়েছে। একথা শুনে সকলে হায় হায় করে বলতো লাগলো — ধর্মের ঢোল ধর্মেই বাজায়, ধর্মাবতার। বাইরে থেকে বিন্দুরাম হাজারী সকল কথা শুনে লজ্জায় ঘৃণায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আর ভাবছে — তা হলে আমার ছোট বৌ একজন যাদুকরী ! একথা তো জানতাম না। সঙ্গে সঙ্গে তার বড় বৌয়ের কথাও মনে পড়তে লাগলো। আমার বড় বৌকেও সে নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছে। আর রাংচাককে ফিঙ্গে করে দিয়েছে সর্বনাশী।

এদিকে রাজা ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন — ফিঙ্গে করে দিয়েছিস তো দিয়েছিস। সে আবার মানুষ হবে কেমন করে? হাজারীর স্ত্রী বলছে— মহারাজ, ফিঙ্গের মাথায় একটি গোল টিকলি মন্ত্র পড়ে লাগিয়ে দিয়েছি। সেটা খুলে ফেলে দিলেই আবার মানুষ হবে। আচ্ছা, এবার রাংচাকের মাকে কি করেছিস বল ? আবার হাজারীর স্ত্রী মিথ্যা কথা বলতে লাগলো — তাকে কয়েকজন লোক ধরে নিয়ে গিয়েছে। রাজা ভয়ানক রেগে বললেন - বারবার মিথ্যা বলিস না বলে দিচ্ছি। সত্য কথা বল। আমি তোর একথা মোটেও বিশ্বাস করি না। হয় সত্য কথা বল, না হয় তো তোর সামনেই তোর মেয়ের মাথা কেটে ফেলবো। তথাপি তার সতীনের কথা বলছে না দেখে রাজা তরবারি খুলে রূফাইতিকে কাটবার জন্য এগিয়ে গিয়ে বলছেন — এবার তোর মেয়ের রাজরাণী হবার সখ মিটিয়ে দিচ্ছি। এবার হাজারীর স্ত্রী কেঁদে কেঁদে চিৎকার করে বলছে — ধর্মাবতার, সত্যি কথা বলছি, রক্ষা করুন মহারাজ। রাজা বললেন — শীঘ্র বল, তোর জন্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে আমি রাজী নই। হাজারীর স্ত্রী কেঁদে কেঁদে কচ্ছপ করে দেওয়ার কথা বলে শুনালো। রাজা একথা শুনে উত্তেজিত হয়ে বললেন — সে কচ্ছপটি এখন কোথায়? মহারাজ, তাকে কেটে খেয়ে ফেলেছে। রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন — কচ্ছপটিকে কে কেটেছিল ? হাজারীর স্ত্রী বলছে — হাজারী কেটেছিল। হাজারীকে ঘরের ভিতর ডেকে এনে জিজ্ঞেস করা হল। তুমি তোমার স্ত্রীকে কেটেছো ? হাজারী অবাক হয়ে বললো — ধর্মাবতার, কচ্ছপটি যে আমার স্ত্রী ছিল একথা আমি জানতাম না। ছোট স্ত্রী কাটবার জন্য

বললে আমি সাধারণ কচ্ছপ বলেই কেটেছিলাম। আমি এইমাত্র জানলাম কচ্ছপটি আমার বড়স্ত্রী, রাণীমা রাংচাকের মা। রাজা হাজারীর স্ত্রীকে আবার জিজ্ঞেস করছেন — যাদুবিদ্যা কোথায় শিখেছিস ? এতক্ষণে হাজারীর স্ত্রী থর থর করে কাঁপতে লাগলো। মন কাঁটার বিষের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলো। সারা গায়ে তিল ধারণেরও জায়গা নেই। আস্তে আস্তে সমস্ত শরীরে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হতে লাগলো। অতি ক্ষীণ কন্ঠে রাজার কথার উত্তর দিতে লাগলো — আমার বাবার কাছে যাদুবিদ্যা শিখেছিলাম। রাজা বললেন — তোর বাবা এখন কোথায় ? সে উত্তর করলো বাবা নেই। এক বৎসর হয় তিনি মারা গেছেন। কথাগুলো খুব কষ্টের সঙ্গে বললো। তারপর জ্বালায় ছটফট করতে লাগলো। মার অবস্থা দেখে রূফাইতি আস্তে আস্তে মার কাছে গেলে তার মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না। ঠোঁট দুটি শুধু কাঁপতে লাগলো — আর চোখের জল দু'গন্ড বেয়ে ঝরতে লাগলো। এর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ নিশ্বাস ফেললো। মার এরূপ শোচনীয় মৃত্যু দেখে রূফাইতি অজ্ঞান হয়ে গেল।

তারপর রাজবাড়ীর লোকসহ হাজারী দু'টি লাস নিয়ে বাড়ীর দিকে চলে গেল। হাজারী তার যাদুকরী স্ত্রীর জঘন্যতম কাজে পাগলের মত হয়ে গেল। রাজা দুষ্টা নারীর উচিত শাস্তি দিয়ে রাজ অন্তঃপুরে গিয়ে দেখতে পেলেন প্রিয়তমা রাণী রাংচাক কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে পড়েছেন। আদর করে বলছেন — প্রিয়া রাংচাক, তুমি কেন অনর্থক দুষ্টা ডাইনীদের জন্য কাঁদছো ? আজ হতে তোমার সমস্ত দুঃখের অবসান হল। রাণী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিনম্র স্বরে বললেন — মহারাজ, এর চাইতে কি আর লঘু শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না? রাজা বললেন — ছিল নিশ্চয়। কিন্তু ভেবে দেখো রাণী, একটা দুষ্ট মেয়েলোকের জন্য আমার অন্যান্য প্রজাদেরও অনেক কষ্ট হতে পারত। এরকম একটি বদ মেয়েলোককে মেরে ফেলাতে ভালই হয়েছে ; তার জন্য তুমি দুঃখ করো না। তোমার মাকে কচ্ছপ বানিয়ে তাঁকে কেটে খেয়ে ফেললো, তোমাকে ফিঙ্গে করে দিয়ে কতই কষ্ট দিয়েছে। সে আমারও অনেক অনিষ্ট করতে পারতো। পাড়ার লোক তাকে

ভয় করে চলতো, কখন কার কি অনিষ্ট করে ফেলে। এবার পাড়ার লোকেরও সে ভয় চলে গেল। রাজার ধর্ম দুষ্টের দমন করা। রাণী তার মায়ের কথা মনে করে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। এখন বুঝতে পারলেন কচ্ছপটিই যে তার মা ছিলেন। রাণী কেঁদে কেঁদে বলছেন — মহারাজ আমার জন্যই আমার স্নেহময়ী মার প্রাণ গেল। আমাকে ডিম পেড়ে খাওয়াতেন বলে হিংসায় সৎমা তাকে খেয়ে ফেলেছিল। রাজাও সহানুভূতি দেখিয়ে বলতে লাগলেন — রাণী দুঃখ করোনা, মরে গিয়েও তোমার কল্যাণী মা তাঁর পবিত্র হাড় দিয়ে গয়না করে দিয়ে তোমার আমার মিলনের যোগসূত্র তৈরী করে দিয়েছেন। স্বর্গ থেকে তিনি নিশ্চয় তোমাকে আশীর্বাদ করছেন ! তাই তুমি ফিঙ্গে হয়ে আবার মানুষ হতে পেরেছো। রাণী খুশী হয়ে বললেন — হ্যাঁ মহারাজ, এ কথা সত্য। তিনি আশীর্বাদ করছেন বলেই আমি বিপদ থেকে পার হতে পারছি। রাজা বললেন — তাই তো বলছি। দুষ্ট লোকের জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। তোমার সমস্ত বিপদ কেটে গেছে — আর কোন চিন্তা নেই। না মহারাজ, এখনও আমার বিপদ ঘটতে পারে — দিদি তো জীবিত রয়েছে। যদি সৎমা তাকে যাদুবিদ্যা শিখিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে তো সেও কম করবে না। তাই তো ভয় পাচ্ছি, আমি যে ওদের কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। রাজা বললেন — না, সে কোন প্রকারেই রাজবাড়ীতে আসতে পারবে না। তোমার অনিষ্টও আর করতে পারবে না। তার সঙ্গে তুমি কোনপ্রকার সম্পর্ক রেখো না। তাকে রাজবাড়ীতে কোনদিনও আসতে দেওয়া হবে না। রাণী খুব দুঃখিত হয়ে বলছেন — বাবার জন্য যে প্রাণ কাঁদছে, শেষ বয়সে কতই না আঘাত পেলো। মাকে নাকি বাবা খুব ভালবাসতেন। তাই সৎমা তাকে কৌশল করে সরিয়ে দিয়েছেন। রাজা বললেন — হ্যাঁ তোমাকেও সে সরিয়ে ফেলতেই চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। রাণী বললেন — দিদিও এত খারাপ ছিল না। তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে সৎমা খারাপ করেছিল। মহারাজ, দিদি কিন্তু তোমাকে ভালবাসতো আমি তা জানতে পেরেছিলাম। তুমি যখন রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেছিলে তখন দিদি তোমাকে দেখে গিয়েছিল। আমার কাছে তোমার সৌন্দর্যের কথা বলে বলে আনন্দ পেত। আমি তোমাকে বিয়ে করবার জন্য দিদিকে বলেছিলাম। দিদি তখন তোমাকে দেখলে নাকি জীবন সার্থক হয়

বলেছিল। সৎমারও খুব আশা ছিল দিদিকে তোমার সাথে বিয়ে দেয়। রাজা বললেন — সে আমাকে ভালবাসলে কি হবে রাংচাক, আমি তো ভালবাসিনি। সত্যিই, যাদুকরী ভেবেছিল যুবক রাজা রূফাইতিকে দেখলেই দু'একদিনেই রাংচাকতিকে ভুলে যাবে। কিন্তু বিধাতা যে অন্যরকম ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তারপর রাজা সমস্ত সমস্যা সমাধান করে প্রিয়তমা রাণী রাংচাককে নিয়ে সুখ শান্তিতে রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন। রাণী রাংচাকের গুণে রাজবাড়ী আবার সুখশান্তিতে ভরে উঠলো। চারিদিক যেন হেসে উঠলো। রাণী রাংচাকের মনোবল আরও দৃঢ় হয়েছে। এনে দিয়েছে তাকে নতুন জীবন গঠনের তাগিদ। তাই ভেঙ্গে পরা মন আবার বল পেয়েছে। নষ্ট হওয়া সুখ শান্তি আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করলো।

বিন্দুরাম হাজারী অনেক যত্ন করে রূফাইতিকে বাঁচিয়ে তুললো। কিন্তু রূফাইতির মন আর সুস্থ হল না। সর্বদা মাকে ডেকে ডেকে বিলাপ করে কাঁদতে লাগলো। মাগো মা তোমার মেয়েকে রাজরাণী করে সুখী করবে বলে তোমার কতই আশা ছিল। সেজন্য কত কষ্টই না পেয়েছো। কিন্তু মেয়েকে রাজরাণী করতে পারলে কোথায়? আমি তো তাঁকে স্বামী বলে মনে করে আমার দেহ মন সবই দিয়েছিলাম। তিনি তো তা গ্রহণ করলেন না। আমার এখন জীবন রেখে আর লাভ কি ? ছোট বোনের প্রাণে কতই না কষ্ট দিয়েছি। ছোট বোনকে আমি আমার মনের কথা কেমন করে বুঝাবো ! কেমন করে তার কাছে মুখ দেখাবো ? ভাল ঘরে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে সুখী করতে কোন বাপ-মার ইচ্ছা না হয় ? কিন্তু মাগো, তুমি তো সহজ পথে গেলে না। রাজরাণী করবার দুরাশায় তোমার নিজের জীবন পর্যন্ত দিলে। এখন তুমি এসে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। এমনি করে একদিন ছোট বোন রাংচাকও মা হারিয়ে কতই না কেঁদেছিল। আজ আমি তার ফল পাচ্ছি। আমি আর বাঁচতে চাই না মা। যে পূজার ফুল দেবতা নিলেন না, তাকে নদীর জলে বিসর্জন দেওয়াই ভাল।

বিন্দুরাম হাজারী মেয়েকে অনেক বুঝাতো। কিন্তু কিছুতেই সে বুঝ মানতো না। হাজারী মেয়ের করুণ কান্নায় অস্থির হয়ে পরতো। তাই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে

তার মন পরিবর্তন করবার জন্য হাজারী একটি ভাল ছেলে খোঁজ করতে লাগলো। কিন্তু রুফাই তা জানতে পেরে একদিন তাদের গাঁয়ের পাশের নদীর পারে বসে মাকে ডেকে ডেকে করুণ সুরে কাঁদতে লাগলো আর গাইতে লাগলো —

" অ আমা-আমা আনি বাগয়ছে অছুক খালাইঅয়
নুংলে বুজাকতুতুই থুইখা,
আনি ছাক বাই বখা-ন রুঅয়-বব-ন
বিরমান ছে জব্বই মানখা।
নছাজুক-ন বুবাগ্রানি বিহিক খালাইনাছে
দুখু-ন ছে নাঅয় থাংখা,
আমা তমানি বাগয় তাই থাঙ্গয় তংনানি।
বখাছে বাইঅয় থাংখা।
অ আমা, আ-নব তিলাংদি দ —
ফাইঅয় নাইফাইদি বা —
বখাছে খাময় খাংখা।"

অর্থাৎ — মাগো, আমার জন্য এত করে তুমি মার খেতে খেতে প্রাণ দিয়েছ। আমি আমার দেহ-মন তাঁকে দিয়ে কি যন্ত্রণাই পেয়েছি। তোমার মেয়েকে রাজরাণী করতে গিয়ে শুধু দুঃখই পেয়েছ। মাগো, আর কিসের জন্য বেঁচে থাকবো বল ? বুক যে আমার ভেঙ্গে গেছে। মাগো, আমাকে নিয়ে যাও, তুমি এসে দেখে যাও। আমার বুক পুড়ে গেছে।

রুফাইতির করুণ কান্নায় পশুপাখি, গাছপালা পর্যন্ত কাঁদতে লাগলো। এমনি করে গান গেয়ে গেয়ে একসময় রুফাইতি পাহাড়ী নদীর প্রচন্ড স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু কি আশ্চর্য! রুফাইতির শরীরের ছোঁয়া লাগা মাত্র নদীর জল রূপার

রং ধরে ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠলো। তাই সেদিন থেকে নদীটির নাম হল 'রূফাই'। আজও রূফাই নদী কলকল সুরে প্রাচীনকালের এক আদিবাসী কন্যার ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী যেন আমাদিগকে শুনিয়ে যাচ্ছে।

ঃ সমাপ্ত ঃ